যাকাত গ্রহীতার আদব

যাকাত গ্রহীতার আদব পাঁচটি ঃ (১) সে মনে করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে এক চিন্তা ছাড়া সকল চিন্তা থেকে মুক্ত রাখার জন্যে অন্যের উপর যাকাত ওয়াজেব করেছেন। মানুষের নিষ্ঠাকে আল্লাহ তাআলা এবাদত সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ, মানুষ কেবল আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের কথা চিন্তা করবে– অন্য কোন চিন্তায় মগ্ন হবে না। নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থ তাই ঃ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ আমি মানুষ ও জ্বিনকে একমাত্র আমার এবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু আল্লাহ তাআলার আদি রহস্যের তাগিদ অনুযায়ী বান্দার উপর কামনা-বাসনা ও অভাব-অনটন চাপিয়ে তার চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত করা হয়েছে। তাই অনুগ্রহস্বরূপ তাকে বিভিন্ন নেয়ামতও পৌঁছানো হয়েছে, যাতে তার অভাব অনটন মোচনের জন্যে যথেষ্ট হয়। এ দৃষ্টিতে প্রভূত ধন-সম্পদ সৃষ্টি করে বান্দার হাতে দেয়া হয়েছে। এসব ধন-সম্পদ বান্দার প্রয়োজনাদি মেটানোর ওসিলা এবং এবাদতের জন্যে অবকাশ লাভের উপায়। আল্লাহ তাআলা কতক বান্দাকে অগাধ ধন-দৌলত দান করেছেন, যাতে তা তাদের জন্যে পরীক্ষা হয়। কতক লোককে তিনি তাঁর মহব্বত দ্বারা গৌরবান্বিত করে দুনিয়ার ঝামেলা থেকে এমনভাবে বাঁচিয়ে রেখেছেন, যেমন দরদী ও স্নেহশীল চিকিৎসক রোগীকে কুপথ্য থেকে বাঁচিয়ে রাখে। অর্থাৎ, তিনি তাদেরকে দুনিয়াব অতিরিক্ত সাজসরঞ্জাম থেকে আলাদা রেখেছেন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ ধনীদের হাত দিয়ে তাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন, যাতে উপার্জনের চিন্তা, সঞ্চয়ের পরিশ্রম, হেফাযতের পেরেশানী ধনীদের দায়িত্বে থাকে এবং তার লাভ ফকীররা ভোগ করে; ফলে তারা আল্লাহ তাআলার এবাদতেই সর্বক্ষণ মগ্ন থাকে এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ফকীরদের প্রতি এটি আল্লাহ তায়ালার পরম নেয়ামত। ফকীরদের উচিত এ নেয়ামতের কদর করা এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করা, দুনিয়ার সাজসরঞ্জাম থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন রেখে আল্লাহ তাদের প্রতি একান্তই কৃপা করেছেন।

সারকথা, ফকীর যা নেবে, তদ্দ্বারা স্বীয় রিযিক ও এবাদতে সাহায্য

লাভের উদ্দেশে নেবে। যদি তা সম্ভবপর না হয়, তবে এ দানের অর্থ আল্লাহ তাআলার অনুমোদিত খাতে ব্যয় করবে। যদি এই অর্থ দ্বারা পাপ কাজে সাহায্য লাভ করে, তবে সে আল্লাহর নেয়ামতের অকৃতজ্ঞ হবে এবং তাঁর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির পাত্র হবে।

(২) ফকীর দাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হবে এবং তার জন্যে নেক দোয়া করবে। দোয়া এভাবে করবে যেন দাতাকে মধ্যবর্তী ছাড়া অন্য কিছু মনে না করা হয়। বরং এটাই বুঝবে, আল্লাহর নেয়ামত পৌঁছার পথ ও উপায় এ ব্যক্তি হয়ে গেছে। এ ধারণা নেয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে বলে বিশ্বাস করার পরিপন্থী নয়। সেমতে হাদীসে বলা হয়েছে– من لم يشكر الناس لم يشكر الله যেব্যক্তি মানুষের শোকর করে না, সে আল্লাহ তাআলার শোকর করে না। আল্লাহ তাআলা বান্দার আমলের জন্যে তার প্রশংসা অনেক জায়গায় করেছেন। উদাহরণতঃ এক জায়গায় বলেছেন– نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ আইউব চমৎকার বান্দা। সে আমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। আরও অনেক আয়াতে এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। গ্রহীতা এভাবে দোয়া করবে– আল্লাহ পবিত্র লোকদের অন্তরের সাথে আপনার অন্তরকে পবিত্র করুন এবং সৎকর্মীদের কর্মের সাথে আপনার কর্মকে পরিষ্কার করুন। শহীদদের আত্মা সাথে আপনার আত্মার প্রতি রহমত নাযিল করুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কেউ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করলে তুমি তাকে কিছু বিনিময় দাও। আর কিছু সম্ভব না হলে তার জন্যে দোয়া কর। এত দোয়া কর যেন প্রতিদান হয়ে গেছে বলে তোমার মনে বিশ্বাস জন্মে। শোকরের পরিশিষ্ট হচ্ছে, দানের মধ্যে কিছু দোষ থাকলে তা গোপন করবে এবং তার নিন্দা করবে না। দাতা যদি না দেয়, তবে তাকে লজ্জা দেবে না। দিলে তার কাজকে মানুষের সামনে বড় বলে প্রকাশ করবে। কেননা, দাতার আদব হল নিজের দানকে ছোট মনে করা এবং কৃতজ্ঞ হওয়া।

(৩) গ্রহীতা যে অর্থ নিতে চায়, তা হারাম কিনা প্রথমে দেখে নেয়া উচিত। নাজায়েয ও হারাম হলে তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা অন্য কোথাও থেকে তাকে দেয়াবেন। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং এমন জায়গা থেকে তাকে রিযিক দেন, যার কল্পনাও সে করে না। এরূপ নয় যে, কেউ হারাম থেকে বিরত থাকলে সে হালাল মাল পাবে না। মোট কথা, সরকারী কর্মচারীদের মাল এবং যাদের উপার্জন অধিকাংশই হারাম, তাদের মাল গ্রহণ করবে না। কিন্তু অবস্থা সংকটজনক হলে এবং প্রদত্ত মালের কোন মালিক জানা না থাকলে প্রয়োজনমাফিক তা গ্রহণ করা জায়েয। কেননা, এরূপ মাল খয়রাত করে দেয়াই বিধান।

(৪) গ্রহীতা সন্দেহের জায়গা থেকে বেঁচে থাকবে এবং যা নেবে তার পরিমাণে সন্দেহ হলে যতটুকু জায়েয, ততটুকুই নেবে। নিজের মধ্যে হকদার হওয়ার কারণ বিদ্যমান আছে– একথা না জানা পর্যন্ত নেবে না। উদাহরণতঃ যদি ঋণী হওয়ার কারণে যাকাত নেয়, তবে ঋণের পরিমাণের বেশী নেবে না। যদি মুসাফির হওয়ার কারণে যাকাত নেয়, তবে পাথেয় এবং গন্তব্যস্থানে পৌঁছা পর্যন্ত যানবাহনের যা ভাড়া লাগে, তার বেশী নেবে না। এসব বিষয়ের আন্দাজ গ্রহীতা নিজের ইজতেহাদ দ্বারা করবে। এর কোন সীমা নির্দিষ্ট নেই। মোট কথা, প্রয়োজন পরিমাণ হয়ে গেলে যাকাতের মাল বেশী গ্রহণ করবে না; বরং এই বছরের জন্যে যথেষ্ট হয়, এই পরিমাণ গ্রহণ করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন পোষ্যদের জন্যে এক বছরের খাদ্য একত্রিত করেছেন। অতএব ফকীর ও মিসকীনের জন্যে এ সীমাই নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। যদি একমাস অথবা একদিনের প্রয়োজন পরিমাণ গ্রহণ করে ক্ষান্ত হয়, তবে এটা তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।

যাকাত ও খয়রাত থেকে ফকীরের কি পরিমাণ গ্রহণ করা উচিত, এ সম্পর্কে আলেমগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ এত বেশী কম বলেন যে, একদিন এক রাতের খাদ্যের বেশী না নেয়া তাদের মতে ওয়াজেব। তাদের এ দাবীর সমর্থনে সহল ইবনে হানযালিয়া বর্ণিত একটি হাদীস পেশ করা হয়ে থাকে। তা এই, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মালদারী থাকা

অবস্থায় সওয়াল করতে নিষেধ করেছেন। এর পর মালদারী কি, এ প্রশ্নের জওয়াবে তিনি বলেছেন– সকাল ও সন্ধ্যার খাদ্য থাকা। কেউ কেউ বলেন, ধনাঢ্যতার সীমা হচ্ছে যাকাতের নেসাব। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা যাকাত কেবল ধনাঢ্যদের উপর ফরয করেছেন। তারা এর অর্থ এই বের করেছেন, নিজের জন্যে এবং পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে যাকাতের নেসাব পর্যন্ত গ্রহণ করা জায়েয। কেউ কেউ ধনাঢ্যতার সীমা পঞ্চাশ দেরহাম বলেছেন। কেননা, হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

من سال وله ما يغنيه جاء يوم القيامة وفى وجهه خموس وقيل وما غناه قال خمسون درهما او قيمتها من الذهب.

যেব্যক্তি মালদার হওয়া সত্ত্বেও সওয়াল করবে, সে কেয়ামতের দিন মুখমণ্ডলে ঘা নিয়ে উপস্থিত হবে। প্রশ্ন করা হল ঃ মালদারী কি? তিনি বললেন ঃ পঞ্চাশ দেরহাম অথবা তার সমতুল্যের স্বর্ণ। কথিত আছে, এ হাদীসের একজন রাবী দুর্বল। কেউ কেউ ধনাঢ্যতার সীমা চল্লিশ দেরহাম বর্ণনা করেছেন। কেননা, আতা ইবনে ইয়াসারের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ من سأل وله اوقية فقد الحف فى السوال এক ওকিয়া অর্থাৎ, চল্লিশ দেরহাম থাকা সত্ত্বেও যেব্যক্তি সওয়াল করে, সে অযথা সওয়াল করে। অন্য আলেমগণ বিষয়টি অধিক প্রশস্ত করে বলেছেন ঃ ফকীর এই পরিমাণে গ্রহণ করতে পারে, তদ্দ্বারা এক খণ্ড জমিন ক্রয় করে জীবনের জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে যায় অথবা কোন পণ্য সামগ্রী ক্রয় করে অভাবমুক্ত হয়ে যায়। কেননা, জীবিকার জন্যে নিশ্চিন্ত হওয়াকেই নিশ্চিন্ততা বলে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ যখন এই দান কর, তখন ধনী করে দাও। কারও কারও মতে, কোন ব্যক্তি ফকীর হয়ে গেলে সে এই পরিমাণ গ্রহণ করতে পারে, যদ্দ্বারা তার পূর্বাবস্থা বহাল হয়ে যায়, যদিও তা দশ হাজার দেরহাম দ্বারা হয়। একবার হযরত আবু তালহা (রাঃ) তাঁর বাগানে নামায পড়ছিলেন। এমতাবস্থায় বাগানের দিকে তাঁর ধ্যান চলে যাওয়ায় তিনি বললেন ঃ আমি এ বাগান খয়রাত করলাম।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে বললেন ঃ তুমি এ বাগান তোমার আত্মীয়দের মধ্যে খয়রাত কর। এটা তোমার জন্যে ভাল। সেমতে তিনি বাগানটি হযরত হাস্সান ও আবু কাতাদাহ্ (রাঃ)-কে দান করে দিলেন। একটি খোরমার বাগান পেয়ে তারা উভয়েই ধনী হয়ে গেলেন। হযরত ওমর (রাঃ) জনৈক গেঁয়ো ব্যক্তিকে একটি বাচ্চা উট সেটির পিতামাতাসহ দিয়ে দেন। এসব রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায়, ফকীররা বেশী গ্রহণ করতে পারে। আমাদের মতে, নিম্নে এক দিবা-রাত্রির খাদ্য অথবা চল্লিশ দেরহাম থাকলে সওয়াল করবে না এবং দ্বারে দ্বারে ঘুরাফেরা করবে না। ভিক্ষাবৃত্তি নিন্দনীয়। এ ব্যাপারে পরহেযগার ব্যক্তিকে বলে দেয়া উচিত, তুমি তোমার মনের কাছ থেকে ফতোয়া নাও, অন্যেরা তোমাকে যত ফতোয়াই দিক না কেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)ও তাই বলেছিলেন। গ্রহীতা যদি সেই মালের ব্যাপারে মনে কোন খটকা পায়, তবে আল্লাহকে ভয় করে মাল গ্রহণ করা উচিত। ফতোয়াকে বাহানা বানিয়ে তা গ্রহণ করা উচিত নয়। কেননা, যাহেরী আলেমগণের ফতোয়া প্রয়োজনের শর্ত থেকে মুক্ত এবং এতে অনেক সন্দেহ থাকে। ধার্মিক ও আখেরাতের পথিকদের অভ্যাস সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকা।

(৫) ফকীর মালদার ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে, তার উপর কি পরিমাণ যাকাত ওয়াজেব। জানার পর দেখবে, যতটুকু সে পেয়েছে তা মোট যাকাতের এক-অষ্টমাংশের বেশী কিনা। বেশী হলে তা নেবে না। কেননা, সে এবং তার আরও দু'জন শরীক মিলে কেবল এক-অষ্টমাংশের হকদার। সুতরাং সে এক অষ্টমাংশের এক-তৃতীয়াংশ নেবে, বেশী নেবে না। এটা জিজ্ঞেস করা অধিকাংশ লোকের উপর ওয়াজেব। কারণ, মানুষ এই ভাগাভাগির প্রতি লক্ষ্য করে না মূর্খতার কারণে অথবা সহজ করার কারণে। তবে হারাম হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল না হলে এসব বিষয় জিজ্ঞেস না করা জায়েয।

নফল দান-খয়রাত ও তার ফযীলত

নফল দান খয়রাতের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীস নিম্নরূপ ঃ

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ সদকা কর যদিও তা একটি খেজুর হয়। কেননা, এটা ক্ষুধার্তের কিছু না কিছু কষ্ট দূর করে এবং গোনাহকে এমনভাবে নির্বাপিত করে, যেমনভাবে পানি অগ্নি নির্বাপিত করে। তিনি

আরও বলেন ঃ

اتقوا النار ولو بشق تمرة فان لم تجدوا فبكلمة طيبة

অর্থাৎ, এক খন্ড খেজুর দান করে হলেও দোযখ থেকে আত্মরক্ষা কর। যদি তা না পাও, তবে ভাল কথা বলে আত্মরক্ষা কর।

রসূলে করীম (সাঃ) আরও বলেন ঃ যে মুসলমান বান্দা তার পবিত্র উপার্জন থেকে সদকা করে- আল্লাহ তাআলা পবিত্রকেই গ্রহণ করেন- আল্লাহ্ তাআলা এই সদকা ডান হাতে গ্রহণ করেন, অতঃপর তা লালন-পালন করেন, যেমন তোমাদের কেউ উটের বাচ্চা লালন-পালন করে। অবশেষে খেজুর বেড়ে ওহুদ পাহাড়ের সমান হয়ে যায়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবু দারদাকে বললেন ঃ যখন তুমি শুরবা রান্না কর তখন তাতে বেশী পরিমাণে পানি দাও। অতঃপর তা থেকে প্রতিবেশীদেরকে দান কর। তিনি আরও বলেন ঃ যে বান্দা ভাল সদকা দেয়, আল্লাহ তার সম্পদে অনেক বরকত দেন।

এক হাদীসে আছে-

كل امرا فى ظل صدقته حتى يقضى بين الناس -

অর্থাৎ, হাশরের মাঠে মানুষের মধ্যে ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তি তার সদকার ছায়াতলে অবস্থান করবে।

আরও আছে-

الصدقة تسد سبعين بابا من الشر

অর্থাৎ, সদকা অনিষ্টের সত্তরটি দরজা বন্ধ করে।

আরও আছে-

صدقة السر تطفى غضب الرب -

অর্থাৎ, গোপন সদকা পালনকর্তার ক্রোধ নির্বাপিত করে।

এক হাদীসে বলা হয়েছে- যেব্যক্তি সচ্ছলতাবশতঃ দান করে, সে সওয়াবে সেই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম নয়, যে অভাবের কারণে তা কবুল করে। এর উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এই, যেব্যক্তি সদকা কবুল করে নিজের অভাব

দূর করে, যাতে ধর্মের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে, সে সেই দাতার সমান, যে তার দান দ্বারা ধর্মের অগ্রগতির নিয়ত করে। কেউ রসূলে আকরাম (সাঃ)-কে প্রশ্ন করল ঃ কোন্‌টি সদকা উত্তম? তিনি বললেন ঃ এমন সময়ে সদকা করা উত্তম, যখন মানুষ সুস্থ থাকে, মাল আটকে রাখতে চায়, অনেক দিন বাঁচার আশা রাখে এবং উপবাসকে খুব ভয় করে। সদকা দিতে এতদূর বিলম্ব করবে না যে, মরণোন্মুখ অবস্থায় বলতে থাকবে, এই পরিমাণ অমুককে এবং এই পরিমাণ অমুককে দেবে, অথচ তখন তোমার মাল অন্যের অর্থাৎ ওয়ারিসদের হয়ে গেছে। একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীগণকে বললেন ঃ তোমরা সদকা কর। এক ব্যক্তি আরজ করল ঃ আমার কাছে একটি দীনার আছে। তিনি বললেন ঃ এটি নিজের জন্যে ব্যয় কর। লোকটি বলল ঃ আমার কাছে আরও একটি দীনার আছে। তিনি বললেন ঃ এটি স্ত্রীর জন্যে ব্যয় কর। লোকটি বলল ঃ আমার কাছে আরও একটি দীনার আছে, তিনি বললেন ঃ এটি সন্তানদের জন্য ব্যয় কর। লোকটি আরজ করল, আমার কাছে আরেকটি দীনার আছে, তিনি বললেন এটি খাদেমের জন্যে ব্যয় কর। লোকটি বলল ঃ আমার কাছে আর একটি দীনার আছে। তিনি বললেন ঃ এটা যেখানে ভাল মনে কর, ব্যয় কর। রসূলে আকরাম (সাঃ) আরও বলেন ঃ মুহাম্মদ পরিবারের জন্যে সদকা হালাল নয়। কারণ, সদকা মানুষের সম্পদের ময়লা। তিনি আরও বলেন ঃ যেব্যক্তি ভিক্ষুককে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়, ফেরেশতারা তার গৃহের উপর সাত দিন পর্যন্ত ছায়া দান করেন না। দুটি কাজ রসূলুল্লাহ (সাঃ) অন্যের হাতে সোপর্দ করতেন না– নিজে করতেন। এক, ওযুর পানি নিজে রাখতেন ও তা ঢেকে দিতেন এবং দুই, মিসকীনকে নিজের হাতে দান করতেন। তিনি বলেন ঃ সে ব্যক্তি মিসকীন নয়, যাকে এক খেজুর অথবা দুই খেজুর এবং এক লোকমা অথবা দুই লোকমা দিয়ে বিদায় করা হয়; বরং সেই মিসকীন যে সওয়াল থেকে বিরত থাকে। তুমি এ আয়াত পড়ে দেখ–

لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ـ

অর্থাৎ, তারা মানুষের কাছে গায়ে পড়ে সওয়াল করে না।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ যে মুসলমান অন্য কোন মুসলমানকে বস্ত্র পরিধান করায়, সে মিসকীনের গায়ে ঐ বস্ত্রের তালি থাকা পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলার হেফাযতে থাকে।

নফল সদকা সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম ও বুযুর্গগণের উক্তি নিম্নরূপ ঃ

ওরওয়া ইবনে যুবায়র (রাঃ) বলেন ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) পঞ্চাশ হাজার দেরহাম খয়রাত করেন অথচ তাঁর কোর্তায় তালিই থাকত। হযরত ওমর (রাঃ) বলতেন ঃ ইলাহী, ধনসম্পদ ও ধনাঢ্যতা আমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তিকে দান করুন। সম্ভবতঃ সে তা আমাদের অভাবগ্রস্তদেরকে পৌঁছাবে। আবদুল আজীজ ইবনে ওমায়র (রহঃ) বলেন ঃ নামায মানুষকে অর্ধেক পথে পৌঁছায়, রোযা বাদশাহের দ্বারে নিয়ে যায় এবং সদকা বাদশাহের সামনে উপস্থিত করে। ইবনে আবিল জা'দ (রহঃ) বলেন ঃ সদকা মানুষ থেকে সত্তর প্রকার অনিষ্ট দূর করে। প্রকাশ্যে সদকা দেয়ার তুলনায় গোপনে দেয়ায় সত্তর গুণ বেশী সওয়াব। সদকা সত্তর শয়তানের চোয়াল বিদীর্ণ করে। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ এক ব্যক্তি সত্তর বছর আল্লাহ তাআলার এবাদত করার পর কোন একটি কবীরা গোনাহ করায় তার এবাদত বাতিল করে দেয়া হল। অতঃপর সে এক মিসকীনের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে এক খন্ড রুটি সদকা করল। ফলে আল্লাহ তার অপরাধ মার্জনা করে সত্তর বছরের এবাদত বহাল করে দিলেন। লোকমান তাঁর পুত্রকে বললেন ঃ তুমি যখন কোন গোনাহ কর, তখন সদকা করবে। ইয়াহইয়া ইবনে মুআয (রহঃ) বলেন ঃ সদকার দানা ব্যতীত কোন দানা দুনিয়ার পাহাড়ের সমান হয়ে যায় বলে আমার জানা নেই। সদকার দানা অবশ্যই এতটুকু হয়ে যায়। আবদুল আজীজ ইবনে আবী রুয়াদ বলেন ঃ প্রথম যমানায় বলা হত, তিনটি বিষয় জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের মধ্যে দাখিল– রোগ গোপন করা, সদকা গোপন করা এবং বিপদাপদ গোপন করা। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমলসমূহ একে অপরের উপর গর্ব করল। সদকা বলল ঃ আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আবদুল্লাহ (রহঃ) চিনি খয়রাত করতেন এবং বলতেন ঃ আমি দেখলাম, আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ـ

অর্থাৎ, তোমরা প্রিয় বস্তু ব্যয় না করা পর্যন্ত পূর্ণ নেকী পাবে না।

আমি চিনি ভালবাসি, একথা আল্লাহ তাআলা জানেন। নখয়ী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর জন্যে যে বস্তু দেব তাতে কোন দোষ থাকা আমার

পছন্দনীয় নয়। ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের (রহঃ) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন মানুষ সকল দিন অপেক্ষা অধিক ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত ও উলঙ্গ অবস্থায় উত্থিত হবে। অতঃপর যেব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহর জন্যে ক্ষুধার্তকে আহার দিয়ে থাকবে, আল্লাহ তাকে পেট ভরে আহার করাবেন। যেব্যক্তি আল্লাহর জন্যে বস্ত্রহীনকে বস্ত্র পরিধান করিয়ে থাকবে, আল্লাহ তাকে বস্ত্র পরিধান করাবেন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকে ধনাঢ্য করে দিতেন– তোমাদের মধ্যে ফকীর থাকত না। কিন্তু তিনি একজনকে অপরজন দ্বারা পরীক্ষা করেছেন। শা'বী (রহঃ) বলেন ঃ ফকীর ধনীর সদকার যতটুকু মুখাপেক্ষী, যদি ধনী তার তুলনায় আপন সদকার সওয়াবের অধিক মুখাপেক্ষী না হয়, তবে তার সদকা অনর্থক। এ সদকা তার মুখে নিক্ষেপ করা হবে। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন ঃ যে পানি সদকা করা হয় এবং মসজিদে পান করানো হয়, তা থেকে ধনী ব্যক্তি পান করলে আমরা দোষ মনে করি না। কেননা, যে পানি সদকা করে, সে পিপাসার্তদের জন্যে সদকা করে। বিশেষভাবে ফকীর-মিসকীনকে সদকা করার নিয়ত তার থাকে না। কথিত আছে, জনৈক দাস বিক্রেতা এক বাঁদী সঙ্গে নিয়ে হযরত হাসান বসরীর কাছ দিয়ে গমন করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি এই বাঁদী এক দুই দেরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করতে সম্মত আছ কি? সে বলল ঃ না। হাসান বসরী (রঃ) বললেন ঃ যাও, আল্লাহ তাআলা তো এক পয়সা ও এক লোকমা সদকা করার বিনিময়ে বেহেশতের হুর দিতে সম্মত আছেন।

সদকা গোপনে ও প্রকাশ্যে গ্রহণ করা

আধ্যাত্ম পথের পথিকগণ মতভেদ করেছেন, সদকা গোপনে বা প্রকাশ্যে গ্রহণ করার মধ্যে কোন্‌টি উত্তম। কারও মতে গোপনে গ্রহণ করা উত্তম এবং কেউ বলেন, প্রকাশ্যে গ্রহণ করা ভাল। আমরা প্রথমে উভয় বিষয়ের উপকারিতা ও অপকারিতা বর্ণনা করব, এর পর যা সত্য তার ব্যাখ্যা করব। প্রকাশ থাকে যে, গোপনে সদকা গ্রহণ করার উপকারিতা পাঁচটি।

(১) গ্রহীতার গোপনীয়তা বজায় থাকে। প্রকাশ্যে গ্রহণ করলে ভদ্রতার পর্দা ছিন্ন হয়ে যায়, অভাব প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং সওয়াল করার ভীতি দূর হয়ে যায়।

(২) গোপনে সদকা গ্রহণ করলে মানুষের অন্তর ও মুখ নিরাপদ

থাকে। কেননা, প্রকাশ্যে গ্রহণ করলে মানুষ তার প্রতি হিংসা করে অথবা তার গ্রহণ অপছন্দ করে একথা ভেবে যে, সে ধনী হওয়া সত্ত্বেও সদকা গ্রহণ করেছে অথবা বেশী পরিমাণে গ্রহণ করেছে। হিংসা ও কুধারণা বড় গোনাহ। মানুষকে এসব গোনাহ থেকে নিরাপদ রাখা উত্তম। আবু আইউব সুখতিয়ানী (রহঃ) বলেন ঃ আমি নতুন বস্ত্র পরিধান করি না এই আশংকায়, কোথাও প্রতিবেশীদের মনে হিংসা সৃষ্টি না হয়ে যায়। অন্য এক দরবেশ বলেন ঃ আমি আমার ভাইদের খাতিরে অধিকাংশ বস্তুর ব্যবহার বর্জন করি, যাতে তারা একথা না বলে যে, তার কাছে এটা কোত্থেকে এল? ইবরাহীম তায়মীর গায়ে নতুন জামা দেখে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ এটা আপনি কোথায় পেলেন? তিনি বললেন ঃ আমার ভাই খায়সামা আমাকে পরিধান করিয়েছে। যদি জানতাম, তার পরিবারের লোকেরা এটা জানে, তবে কখনও কবুল করতাম না।

(৩) গোপনে দান গ্রহণ করলে দাতাকে গোপনে আমল করতে সাহায্য করা হয়। বলাবাহুল্য, দান গোপনে করাই উত্তম। অতএব এ ব্যাপারে গ্রহীতা দাতাকে সাহায্য করলে উত্তম কাজে সাহায্য করা হবে, যা নিঃসন্দেহে ভাল। দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের প্রচেষ্টা ছাড়া গোপনে দান হতে পারে না। ফকীর নিজের অবস্থা প্রকাশ করে দিলে দাতার অবস্থাও প্রকাশ হয়ে পড়বে। এক ব্যক্তি জনৈক আলেমকে প্রকাশ্যে কিছু দান করলে তিনি গ্রহণ করলেন না। অন্য এক ব্যক্তি তাকে গোপনে কিছু দান করলে তিনি গ্রহণ করলেন। অতঃপর এ কারণ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন ঃ দ্বিতীয় ব্যক্তি তার খয়রাতে আদব ও নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে– গোপনে দিয়েছে। তাই আমি কবুল করেছি। এক ব্যক্তি জনৈক দরবেশ সুফীকে জনসমাবেশে কিছু দান করলে দরবেশ তা ফিরিয়ে দিলেন। লোকটি বলল ঃ যে বস্তু আপনাকে আল্লাহ তাআলা দিলেন, তা গ্রহণ করলেন না কেন? দরবেশ বললেন ঃ যে বস্তু একান্তভাবে আল্লাহর ছিল, তাতে অপরকে শরীক করে নিয়েছ। কেবল আল্লাহর দেখা তুমি যথেষ্ট মনে করনি। কাজেই তোমার শেরক আমি তোমার কাছেই ফিরিয়ে দিলাম। জনৈক সাধক এক বস্তু গোপনে কবুল করে নিলেন, যা তিনি প্রকাশ্যে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। দাতা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ প্রকাশ্যে দেয়ার কারণে তুমি আল্লাহর নাফরমানী করেছিলে। তাই আমি তোমাকে সাহায্য করিনি। এখন গোপনে দেয়ার

কারণে তুমি আল্লাহর আনুগত্য করেছ। তাই আনুগত্যের কাজে আমি তোমাকে সাহায্য করেছি। সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন ঃ যদি আমি জানতাম, কোন ব্যক্তি দান করে তার আলোচনা করবে না এবং অন্যের কাছে বলবে না, তবে আমি তার দান গ্রহণ করতাম।

(৪) গোপনে গ্রহণ করলে গ্রহীতা অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে বেঁচে থাকে। প্রকাশ্যে গ্রহণ করলে লাঞ্ছনা হয়। নিজেকে লাঞ্ছিত করা ঈমানদার ব্যক্তির জন্যে শোভন নয়। কোন আলেমকে গোপনে কেউ কিছু দিলে তিনি তা গ্রহণ করতেন এবং প্রকাশ্যে দিলে গ্রহণ করতেন না। তিনি বলতেন ঃ প্রকাশ্যে নেয়ার মধ্যে এলেমের লাঞ্ছনা এবং আলেমগণের বেইযযতী হয়। তাই আমি দুনিয়ার ধন-সম্পদকে উঁচু করে বিনিময়ে এলেম ও আলেমগণকে নীচু করি না।

(৫) গোপনে গ্রহণ করলে শরীকানার সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকা যায়। কারণ, রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তির কাছে কোন উপঢৌকন আসে, তার কাছে যত লোক থাকে, তারা সকলেই উপঢৌকনে শরীক থাকে। স্বর্ণ-রৌপ্য হলেও তা উপঢৌকন। কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ মানুষের দেয়া উত্তম উপঢৌকন হচ্ছে রূপা অথবা খাদ্য, যা খাওয়ানো হয়। এতে রূপাকেও উপঢৌকন বলা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল, জনসমাবেশে সকলের সম্মতি ছাড়া বিশেষ কোন ব্যক্তিকে কিছু দেয়া মাকরূহ। সকলের সম্মতি সন্দিগ্ধ বিধায় একান্তে দিলে এই সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকা যায়।

এখন সদকা প্রকাশ্যে গ্রহণ করা এবং অন্যের কাছে তার আলোচনা করার মধ্যে যেসকল উপকারিতা রয়েছে, সেগুলো বর্ণিত হচ্ছে। এতে চারটি উপকারিতা আছে।

(১) সদকা প্রকাশ্যে গ্রহণ করলে আন্তরিকতা ও সততা প্রকাশ পায়, নিজের অবস্থা সম্পর্কে অপরকে ধোঁকা দেয়া হয় না এবং রিয়া থেকে মুক্ত থাকা যায়। কারণ, এতে বাস্তব অবস্থাই প্রকাশ পায়। এরূপ হয় না যে, বাস্তব অবস্থা অন্যরূপ এবং লোক দেখানোর উদ্দেশে তা প্রকাশ করা হয় না।

(২) প্রকাশ্যে গ্রহণ করলে জাঁকজমকপ্রীতি দূর হয়ে যায়, দাসত্ব ও দীনতা প্রকাশ পায়, অহংকার ও অভাবমুক্ততার দাবী থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া

যায় এবং মানুষের দৃষ্টিতে হেয় হওয়া যায়। এ কারণেই জনৈক সাধক তাঁর শিষ্যকে বলেন ঃ সদকা সর্বাবস্থায় প্রকাশ্যে নেবে। এরূপ করলে তোমার ব্যাপারে মানুষ দু'দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক দল হবে, যাদের মনে তোমার কোন মর্যাদা থাকবে না। এটা তো অভীষ্ট লক্ষ্যই। কেননা, এটা তোমার ধর্মের নিরাপত্তার জন্য অধিক উপকারী। আরেক দল হবে, যাদের মনে তোমার প্রতি সহানুভূতি বেশী হবে। কারণ, তুমি আপন অবস্থা ঠিক ঠিক প্রকাশ করে দিয়েছ। এটা তোমার ভাইয়ের কাম্য। কারণ, তার উদ্দেশ্য বেশী বেশী সওয়াব পাওয়া। সে যখন তোমাকে মহব্বত বেশী করবে তখন সে সওয়াবও অবশ্যই পাবে। এ সওয়াব তুমিও পাবে। কেননা, তার সওয়াব বেশী হওয়ার কারণ তুমিই।

(৩) প্রকাশ্যে সদকা গ্রহণ করলে তওহীদকে শেরক থেকে বাঁচানো যায়। কেননা, সাধকের দৃষ্টি মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য দিকে নিবদ্ধ হয় না। গোপনও প্রকাশ্য তার জন্যে সমান। এ অবস্থার পরিবর্তন তওহীদে শেরকের নামান্তর। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যেব্যক্তি গোপনে গ্রহণ এবং প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করত, আমরা তার দোয়ার কোনই মূল্য দিতাম না। উপস্থিত অথবা অনুপস্থিত মানুষের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হালের ক্ষতি বৈ নয়। দৃষ্টি সর্বদা এক আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট থাকা উচিত। কথিত আছে, জনৈক বুযুর্গ তাঁর মুরীদগণের মধ্যে একজনের প্রতি অধিক আকৃষ্ট ছিলেন। এটা অন্য মুরীদদের কাছে দুঃসহ মনে হলে বুযুর্গ ব্যক্তি তাদের কাছে সেই মুরীদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে চাইলেন। সেমতে প্রত্যেক মুরীদকে একটি করে মুরগী দিয়ে তিনি বললেন ঃ প্রত্যেকেই আপন আপন মুরগী এমন জায়গা থেকে জবাই করে আনবে, যেখানে অন্য কেউ না দেখে। সকল মুরীদ গিয়ে আপন আপন মুরগী জবাই করে আনল। কিন্তু সেই মুরীদ জীবিত মুরগী নিয়ে এল। বুযুর্গ তাকে কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ আমি এমন কোন জায়গা খুঁজে পেলাম না, যেখানে কেউ দেখে না। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা সর্বত্রই দেখেন। বুযুর্গ ব্যক্তি মুরীদগণকে বললেন ঃ এ কারণেই আমি তার প্রতি অধিক আকৃষ্ট। সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর প্রতি ধ্যান দেয় না।

(৪) প্রকাশ্যে সদকা গ্রহণ করলে শোকরের সুন্নত আদায় হয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ তুমি তোমার

পালনকর্তার নেয়ামত বর্ণনা কর। নেয়ামত গোপন করা অকৃতজ্ঞতার শামিল । যারা আল্লাহর নেয়ামত গোপন করে, আল্লাহ তাদের নিন্দা করেন এবং কৃপণ আখ্যা দেন। বলা হয়েছে ঃ

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ـ

অর্থাৎ, যারা কৃপণতা করে, মানুষকে কৃপণতা করতে আদেশ করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহ গোপন করে।

রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দাকে নেয়ামত দেন, তখন বান্দাকে সেই নেয়ামতের উপযোগী দেখাও পছন্দ করেন। এক ব্যক্তি জনৈক সাধককে গোপনে কিছু দিলে সাধক আপন হাত উঁচু করে বললেন ঃ এটা দুনিয়ার বস্তু। এটা প্রকাশ্যে দেয়া উত্তম। আখেরাতের কাজ গোপন করা উত্তম। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ তোমাকে জনসমাবেশে কিছু দেয়া হলে তুমি তা গ্রহণ কর। এর পর একান্তে তা ফেরত দিয়ে দাও। সদকার ক্ষেত্রে শোকরের প্রতি উৎসাহ বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ من لم يشكر الناس لم يشكر الله عزوجل যে মানুষের শোকর করে না, সে আল্লাহরও শোকর করে না। শোকর প্রতিদানের স্থলবর্তী হয়ে থাকে । রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কেউ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করলে তুমি তার প্রতিদান দাও। প্রতিদান সম্ভব না হলে উত্তমরূপে তার প্রশংসা কর এবং সেই পর্যন্ত দোয়া কর, যে পর্যন্ত প্রতিদান হয়ে গেছে বলে তোমার বিশ্বাস না জন্মে। মুহাজিরগণ মদীনায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে শোকর সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমরা আনসারদের চেয়ে উত্তম লোক দেখিনি। আমরা তাঁদের কাছে এলে তাঁরা আপন বিষয়-সম্পত্তি আমাদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন। আমাদের আশংকা হচ্ছে, সব সওয়াব তাঁরাই নিয়ে যাবেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ না, তা নয়। তোমরা যে তাঁদের শোকর করেছ এবং প্রশংসা করেছ, এতে প্রতিদান হয়ে গেছে।

এসব উপকারিতা জানার পর এখন জানা দরকার, এ সম্পর্কে বর্ণিত মতভেদ মূল বিষয়বস্তুর মধ্যে নয়; বরং এটা হাল তথা অবস্থার মতভেদ।

এ ক্ষেত্রে সত্য এই যে, গোপনে গ্রহণ করা সর্বাবস্থায় উত্তম অথবা প্রকাশ্যে গ্রহণ করা ভাল, একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। বরং এটা নিয়তের বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন হয়ে থাকে। হাল ও ব্যক্তির পার্থক্যের কারণে নিয়ত আলাদা আলাদা হয়ে যায়। এমতাবস্থায় এখলাসবিশিষ্ট ব্যক্তির উচিত নিজের দেখাশুনা করা এবং বিভ্রান্তিতে না পড়া। এ ব্যাপারে মনের প্রতারণা ও শয়তানের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। প্রকাশ্যে গ্রহণ করার তুলনায় গোপনে গ্রহণ করার কারণসমূহের মধ্যে ধোঁকা প্রতারণা বেশী রয়েছে– যদিও উভয়ের মধ্যেই প্রতারণা আছে। গোপনে গ্রহণ করার মধ্যে প্রতারণার কারণ, মন গোপনে গ্রহণ করার প্রতি আগ্রহী থাকে। কারণ, এতে জাঁকজমক ও মর্যাদা বহাল থাকে। মানুষের দৃষ্টিতে সম্মান ঠিক থাকে। কেউ মিসকীনকে ঘৃণার দৃষ্টিতে এবং দাতাকে তার প্রতি অনুগ্রহকারী ও নেয়ামতদানকারীরূপে দেখে না। এই রোগ মনের মধ্যে গোপন থাকে এবং শয়তান এর মাধ্যমে উপকারিতা প্রকাশ করে। এমনকি, পূর্ববর্ণিত পাঁচটি উপকারিতাকেই গোপনে গ্রহণ করার কারণরূপে উল্লেখ করে।

প্রকাশ্যে গ্রহণ করার প্রতিও মন আগ্রহী থাকে। কারণ, এতে দাতার মন প্রফুল্ল হয় এবং সে দানে উৎসাহিত হয়। এখানে শয়তান বলে, শোকর আদায় করা সুন্নত এবং গোপন রাখা রিয়া। এমনকি, শয়তান পূর্বোল্লিখিত চারটি উপকারিতাকেও প্রমাণস্বরূপ পেশ করে, যাতে প্রকাশ্যে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা যায়।

অতএব ফয়সালা এই যে, দাতাকে দেখতে হবে। যদি সে শোকর ও প্রকাশ্যে দেয়া পছন্দ করে, তবে তার দান গোপন রাখবে এবং শোকর করবে না। কেননা, শোকর তলব করা একটি জুলুম। এই জুলুমের কাজে তাকে সাহায্য না করা চাই। পক্ষান্তরে যদি দাতা শোকর পছন্দ না করে, তবে গ্রহীতা তার শোকর করবে এবং দান প্রকাশ করবে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে লোকেরা এক ব্যক্তির প্রশংসা করলে তিনি বললেন ঃ তোমরা তাকে মেরে ফেলেছ। সে শুনলে কল্যাণ প্রাপ্ত হবে না। অথচ রসূলুল্লাহ (সাঃ) মানুষের প্রশংসা তাদের উপস্থিতিতে করতেন। কারণ, তিনি তাদের ব্যাপারে আস্থাশীল ছিলেন, এ প্রশংসা তাদের জন্যে ক্ষতিকর হবে না। বরং তাদের সৎ কাজের প্রতি উৎসাহ আরও বৃদ্ধি

করবে। উদাহরণতঃ তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ সে গেঁয়ো লোকদের সর্দার। অন্য এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন ঃ তোমাদের কাছে কোন সম্প্রদায়ের সর্দার আগমন করলে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। এক ব্যক্তির কথাবার্তা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খুব ভাল লাগলে তিনি বললেন ঃ ان من البيان لسحرا নিঃসন্দেহে কিছু বর্ণনা জাদু হয়ে থাকে।

তিনি আরও বলেন ঃ اذا امدح المؤمن ربى الايمان فى قلبه মুমিনের প্রশংসা করা হলে তার অন্তরে ঈমান বৃদ্ধি পায়। সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ যেব্যক্তি নিজেকে সম্যক চেনে, মানুষের প্রশংসা তার জন্যে ক্ষতিকর হয় না। সারকথা, জনসমাবেশে গ্রহণ করা এবং একান্তে না করা উত্তম ও নিরাপদ পন্থা। হাঁ, যদি মারেফত কামেল হয় এবং প্রকাশ্যে গ্রহণ ও গোপনে গ্রহণ উভয়টি সমান হয়ে যায়, তবে গোপনে গ্রহণ করার মধ্যেও দোষ নেই। কিন্তু এরূপ ব্যক্তি অত্যন্ত বিরল। আলোচনায় আছে– বাস্তবে পাওয়া ভার। আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করুন এবং তওফীক দান করুন।

সদকা গ্রহণ করা উত্তম না যাকাত

ইবরাহীম খাওয়াস, জুনায়দ বাগদাদী প্রমুখ বুযুর্গের অভিমত হচ্ছে, যাকাতের তুলনায় সদকার অর্থ গ্রহণ করা উত্তম। কেননা, যাকাতের অর্থ গ্রহণ করলে মিসকীনদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করা হয়। এছাড়া যাকাতের হকদার হওয়ার জন্যে যেসকল বিশেষণ ও শর্ত উল্লিখিত আছে, সেগুলো নিজের মধ্যে থাকে না। সদকার মধ্যে এ ব্যাপারে অবকাশ বেশী । কেউ কেউ বলেন ঃ যাকাত গ্রহণ করা উচিত– সদকা নয়। কেননা, যাকাত গ্রহণ করলে মানুষকে ফরয আদায়ে সাহায্য করা হয়। সকল মিসকীন যাকাত নেয়া ত্যাগ করলে সকল মানুষ গোনাহ্গার হবে। এছাড়া যাকাত কারও অনুগ্রহ নয়। এটা মালদারের যিম্মায় আল্লাহর ওয়াজেব হক। এর মাধ্যমে অভাবী বান্দাদের রুজি অর্জিত হয়। আরও কারণ, যাকাত অভাবের কারণে গ্রহণ করা হয়। অভাব প্রত্যেক ব্যক্তির নিশ্চিতরূপে জানা থাকে। কিন্তু সদকা গ্রহণ করা দ্বীনদারীর কারণে হয়। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দাতা তাকেই সদকা দেয়, যার দ্বীনদারী সম্পর্কে তার বিশ্বাস থাকে ।

এক্ষেত্রে সত্য হচ্ছে, এ বিষয়টি প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ হয়। যে ধরনের অবস্থা প্রবল এবং যেরূপ নিয়ত হয়, সেই ধরনের বিধান হয়ে থাকে। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি সন্দেহ করে, তার মধ্যে যাকাতের হকদার হওয়ার শর্ত আছে কিনা, তবে তার যাকাত গ্রহণ না করা উচিত । আর যদি নিজেকে হকদার বলে নিশ্চিতরূপে জানে, তবে যাকাত গ্রহণ করতে পারে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তির যিম্মায় ঋণ আছে, যা সে উত্তম পথে ব্যয় করেছে। এখন ঋণ শোধ করার কোন উপায় নেই। এরূপ ব্যক্তি নিশ্চিতরূপেই যাকাতের হকদার । তাকে সদকা ও যাকাতের মধ্যে এখতিয়ার দেয়া হলে সে চিন্তা করবে– যদি আমি এই সদকা গ্রহণ না করি, তবে মালিক সদকা করবে না। এমতাবস্থায় সে সদকাই গ্রহণ করবে। আর যদি যাকাত নিলে মিসকীনদের কোন অসুবিধা না হয়, তবে সদকা ও যাকাত প্রত্যেকটি গ্রহণ করবে। এতদসত্ত্বেও নফসকে হেয় করার ব্যাপারে যাকাত গ্রহণের প্রভাব সম্ভবতঃ অনেক বেশী ।
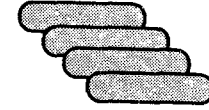
ষষ্ঠ অধ্যায়

রোযার তাৎপর্য

প্রকাশ থাকে যে, রোযা ঈমানের এক-চতুর্থাংশ । কারণ, এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ الصوم نصف الصبر (রোযা সবরের অর্ধেক) এবং অন্য এক হাদীসে বলেন ঃ الصبر نصف الايمان (সবর ঈমানের অর্ধেক)। এ থেকে জানা গেল, রোযা ঈমানের অর্ধেকের অর্ধেক অর্থাৎ এক-চতুর্থাংশ। রোযা আল্লাহ্ তাআলার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিধায় ইসলামের সকল রোকনের মধ্যে এটা সেরা রোকন। সেমতে আল্লাহ তাআলার উক্তি রসূলে করীম (সাঃ) এক হাদীসে কুদসীতে বর্ণনা করেছেন। উক্তিটি এই ঃ সকল সৎ কাজের সওয়াব দশ গুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত হবে; কিন্তু রোযা একান্তভাবে আমার জন্যে বিধায় আমিই এর প্রতিদান দেব। আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ -

অর্থাৎ, সবরকারীদেরকে বেহিসাব সওয়াব দান করা হবে।

রোযা সবরের অর্ধেক। তাই এর সওয়াব হিসাব-কিতাবের আওতা বহির্ভূত হবে। শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যে রসূলে করীম (সাঃ)-এর এ উক্তিই যথেষ্ট, তিনি এরশাদ করেন ঃ

والذى نفسى بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك يقول الله عز وجل يذر شهوته وطعامه وشرابه لاجلى فالصوم لى وانا اجزى به -

আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ– নিশ্চয় রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তাআলার কাছে মেশকের চেয়েও উত্তম। আল্লাহ বলেন, রোযাদার তার কামনা-বাসনা ও পানাহার একমাত্র আমার জন্যে পরিত্যাগ করে। অতএব রোযা আমার জন্যে এবং আমিই এর প্রতিদান

দেব। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বলেন ঃ

للجنة باب يقال له الريان لايدخله الا الصائمون وهو موعود بلقاء الله تعالى هى جزاء صومه -

জান্নাতের একটি দ্বারকে বলা হয় 'বাবুর রাইয়ান'। এতে রোযাদারগণ ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করবে না। রোযাদারকে তার রোযার বিনিময়ে আল্লাহর দীদারের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে ঃ للصائم فرحتان فرحة عند الافطار وفرحة عند لقاء ربه -

রোযাদারের দুটি আনন্দ। এক আনন্দ ইফতারের সময় এবং এক আনন্দ তার পালনকর্তার দীদার লাভ করার সময় ।

এক হাদীসে আছে– প্রত্যেক বস্তুর একটি দরজা আছে। এবাদতের দরজা হল রোযা। আরও বলা হয়েছে ঃ রোযাদারের নিদ্রা এবাদত। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যখন রমযান মাস শুরু হয়, তখন জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। শয়তানকে শিকল পরানো হয়। জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা করে– যারা কল্যাণ কামনা কর, তারা এগিয়ে আস এবং যারা অনিষ্ট কামনা কর তারা সরে যাও। কোরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে– তোমরা অতীত দিনগুলোতে যা পাঠিয়েছ, তার বিনিময়ে আজ জান্নাতে স্বচ্ছন্দে পানাহার কর। এর তফসীর প্রসঙ্গে ওকী বলেন, এখানে অতীত দিন বলে রোযার দিন বুঝানো হয়েছে। কেননা, রোযার দিনে তারা পানাহার ত্যাগ করেছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সংসার ত্যাগ ও রোযাকে গর্বের বিষয়সমূহের মধ্যে এক কাতারে রেখেছেন। সংসার ত্যাগ সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা যুবক এবাদতকারীকে নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করেন এবং বলেন, হে আমার জন্যে আপন বাসনা বর্জনকারী যুবক, হে আমার সন্তুষ্টিতে যৌবন অতিবাহিতকারী যুবক! তুমি আমার কাছে ফেরেশতার মতই। পক্ষান্তরে রসূলুল্লাহ (সাঃ) রোযাদার সম্পর্কে বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের উদ্দেশে বলেন, ফেরেশতাগণ! আমার বান্দাকে দেখ, সে আমার কারণে তার কামনা-বাসনা ও পানাহার ত্যাগ করেছে।

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

অর্থাৎ, কেউ জানে না তাদের আমলের প্রতিদানস্বরূপ তাদের জন্যে কি লুক্কায়িত রয়েছে, যা তাদের চক্ষুকে শীতল করবে।

কোরআনের এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে কোন কোন তফসীরকার বলেন, এখানে আমল বলে রোযা বুঝানো হয়েছে। কেননা, সবরকরীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ.

অর্থাৎ, সবরকারীকে বেহিসাব পুরস্কার দেয়া হবে।

এ থেকে জানা যায়, সবরকারীর জন্যে অগণিত সওয়াবের স্তূপ সাজানো হবে, যা অনুমানও করা যায় না। এরূপ হওয়াই সমীচীন। কেননা, রোযা আল্লাহ তাআলার জন্যে এবং তাঁর সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কারণে গৌরবোজ্জ্বল। সকল এবাদতই আল্লাহর জন্যে। তবুও রোযা কাবা গৃহের ন্যায় প্রাধান্য রাখে, যদিও সমস্ত ভূপৃষ্ঠই আল্লাহর। রোযার এই প্রাধান্য দুটি কারণে– (১) রোযা রাখার অর্থ কয়েকটি বিষয় থেকে বিরত থাকা এবং কয়েকটি বিষয় বর্জন করা। এটি আভ্যন্তরীণ কাজ। এতে এমন কোন আমল নেই, যা চোখে দেখা যায়। অন্যান্য এবাদত মানুষের দৃষ্টিতে থাকে। কিন্তু রোযা আল্লাহ ব্যতীত কেউ দেখে না। (২) রোযা আল্লাহ তাআলার শত্রুর উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং প্রবল হয়। কেননা, কামনা-বাসনা হচ্ছে শয়তানের ওসিলা বা হাতিয়ার, যা পানাহারের মাধ্যমে শক্তিশালী হয় । এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ শয়তান মানুষের ধমনী (রক্ত চলার পথে) বিচরণ করে। সুতরাং ক্ষুধা তৃষ্ণা দ্বারা তার পথসমূহ সংকীর্ণ করে দাও। এদিকে লক্ষ্য করে রসূলে পাক (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছিলেন ঃ সর্বদা জন্নাতের দরজা খট্‌খটাও। আরজ করা হল ঃ কিসের মাধ্যমে? তিনি বললেন ঃ ক্ষুধার মাধ্যমে। যেহেতু রোযা বিশেষভাবে শয়তানের মূলোৎপাটন করে, তার চলার পথ রুদ্ধ এবং সংকীর্ণ করে, তাই রোযা বিশেষভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার যোগ্য হয়েছে। কেননা, শয়তানের মূলোৎপাটনে আল্লাহ সাহায্য করেন। বান্দাকে সাহায্য করা নির্ভর করে বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহকে সাহায্য করার উপর। সে মতে আল্লাহ বলেন ঃ

إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ.

অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদযুগল সুদৃঢ় রাখবেন।

মোট কথা, চেষ্টা শুরু করা বান্দার পক্ষ থেকে এবং বিনিময়ে হেদায়েত তথা সৎপথ প্রদর্শন আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে। যেমন– আল্লাহ বলেন ঃ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا অর্থাৎ, যারা আমার পথে অধ্যবসায় করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথ প্রদর্শন করি। আরও বলেন ঃ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ অর্থাৎ, আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করে। পরিবর্তনের জন্যে কামনা-বাসনাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। কেননা, কামনা বাসনা শয়তানের বিচরণ ক্ষেত্র। যে পর্যন্ত এই বিচরণ ক্ষেত্র সবুজ শ্যামল থাকবে, শয়তানের বিচরণ বন্ধ হবে না। বিচরণ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর প্রতাপ বান্দার কাছে প্রকাশ পাবে না এবং দীদারের পথে পর্দা পড়ে থাকবে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যদি মানুষের অন্তরে শয়তানের যাতায়াত না থাকত, তবে মানুষ ঊর্ধ্বজগত নিরীক্ষণ করতে সক্ষম হত। এদিক দিয়ে রোযা এবাদতসমূহর দরজা ও ঢাল।

রোযার বাহ্যিক ওয়াজেবসমূহ

(১) রমযান মাসের সূচনা জ্ঞাত হওয়া। এটা চাঁদ দেখা অথবা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে শাবানের ত্রিশ দিন পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে জ্ঞাত হওয়া যায়। চাঁদ দেখার উদ্দেশ্য চাঁদ দেখা যাওয়ার কথা জানা, যা একজন আদেল ব্যক্তির কথায় হতে পারে। ঈদুল ফেতরের চাঁদ দুজন আদেল ব্যক্তির কথা ছাড়া প্রমাণিত হয় না। যেব্যক্তি একজন আদেল ব্যক্তির কাছে চাঁদ দেখার কথা শুনে এবং বিশ্বাস করে, তার উপর রোযা ওয়াজেব হবে, যদিও সরকারীভাবে রোযা রাখার আদেশ না হয়। যদি এক শহরে চাঁদ দেখা যায় ও অন্য শহরে দেখা না যায় এবং উভয় শহরের মধ্যবর্তী দূরত্ব বেশী হলে প্রত্যেক শহরের বিধান আলাদা হবে। (প্রকাশ

থাকে যে, হানাফী মাযহাবে দেশের এক শহরে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে সকল শহরের মানুষের উপর রোযা রাখা ওয়াজেব হবে, দূরত্ব বেশী হোক কিংবা কম।)

(২) প্রত্যেক রোযার জন্যে রাত থেকে নির্দিষ্ট করে ও বিশ্বাস সহকারে নিয়ত করা। সুতরাং সমগ্র রমযান মাসের নিয়ত এক দফায় করে নিলে যথেষ্ট হবে না। দিনের বেলায় নিয়ত করলে রমযানের রোযা হবে না; বরং নফল রোযা হবে। (হানাফী মাযহাব অনুযায়ী দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত নিয়ত করা চলে।) শুধু রোযার নিয়ত করলে জায়েয হবে না, বরং নির্দিষ্ট করে রমযানের ফরয রোযার নিয়ত করতে হবে। (হানাফী মাযহাব অনুযায়ী শুধু রোযা কিংবা নফল রোযার নিয়ত করলেও রমযানের ফরয রোযাই হবে।) আগামীকাল রমযান হলে রোযা রাখব- এরূপ সন্দেহজনক নিয়ত করা যথেষ্ট নয়। বরং পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে নিয়ত করতে হবে। (হানাফী মাযহাবে এটা জরুরী নয়।)

(৩) রোযা স্মরণ থাকা অবস্থায় পেটে কোন কিছু যেতে না দেয়া। সুতরাং রোযা রেখে জেনে-শুনে কিছু খেলে অথবা পান করলে অথবা নাকের ছিদ্র পথে কোন বস্তু পেটে চলে গেলে অথবা পেটে ওষুধ প্রবেশ করালে রোযা ভেঙ্গে যাবে। যে বস্তু ইচ্ছা ব্যতিরেকে পেটে চলে যায়; যেমন পথের ধুলাবালি অথবা মাছি অথবা কুলি করার সময় পানি, তাতে রোযা ভঙ্গ হয় না। কিন্তু কুলিতে গরগরা করার সময় পেটে পানি চলে গেলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। কেননা, এটা রোযাদারের ত্রুটি। রোযার কথা ভুলে গিয়ে পানাহার করলে রোযা ভঙ্গ হবে না।

(৪) স্ত্রীসহবাস থেকে বিরত থাকা। যদি রাত্রে সহবাস করে অথবা স্বপ্নদোষ হয় এবং নাপাক অবস্থায় সকাল হয়ে যায়, তবে তাতে রোযা নষ্ট হয় না।

(৫) বীর্যপাত করা থেকে বিরত থাকা। অর্থাৎ, ইচ্ছাকৃতভাবে সহবাসের মাধ্যমে অথবা সহবাস ছাড়াই বীর্যস্খলন ঘটাবে না। এরূপ করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। স্ত্রীকে চুম্বন করলে অথবা কাছে শোয়ালে রোযা নষ্ট হয় না, যে পর্যন্ত বীর্যপাত না হয়, কিন্তু এসব কাজ মাকরূহ।

(৬) বমি করা থেকে বিরত থাকা। ইচ্ছা করে বমি করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। আপনা আপনি হলে রোযা নষ্ট হবে না। গলা থেকে

অথবা বুক থেকে শ্লেষ্মা নির্গত হলে রোযা নষ্ট হবে না। যদি শ্লেষ্মা মুখে পৌঁছার পর তা গিলে ফেলে তবে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

রোযার কাযা ও কাফফারা

কোন ওযরের কারণে অথবা ওযর ছাড়াই রোযা না রাখলে তার কাযা করা ওয়াজেব। রমযানের রোযার কাযা একাদিক্রমে (ফাঁক না দিয়ে) করা ওয়াজেব নয়। সহবাস ব্যতীত অন্য কোন কারণে রোযার কাফফারা ওয়াজেব হয় না। (হানাফী মাযহাবে ওযর ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার অথবা সহবাস করে রোযা ভঙ্গ করলে কাযা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজেব হয়।) উদাহরণতঃ পানাহার এবং সহবাস ব্যতীত বীর্যপাত ঘটালে কেবল কাযা ওয়াজেব হবে- কাফফারা নয়। কাফফারা হল একটি গোলাম মুক্ত করা। এটি সম্ভব না হলে একাদিক্রমে দু'মাস রোযা রাখা। এটাও সম্ভব না হলে ষাট জন মিসকীনকে পেট ভরে খাওয়ানো। যাদের রোযা নিজেদের দোষে নষ্ট হয়ে যায়, তাদের উপর ইমসাক অর্থাৎ দিনের অবশিষ্ট অংশ পানাহার থেকে বিরত থাকা ওয়াজেব। কষ্টের আশংকা না থাকলে সফরে রোযা রাখা এবং কষ্টের আশংকা থাকলে রোযা না রাখা উত্তম। শায়খে ফানী অর্থাৎ যে বৃদ্ধ রোযা রাখার ক্ষমতা রাখে না, সে প্রত্যেক রোযার বিনিময়ে অর্ধ সা' গম দান করবে।

রোযার সুন্নতসমূহ

রোযার সুন্নত ছয়টি- (১) বিলম্বে সেহরী খাওয়া, (২) খোরমা অথবা পানি দ্বারা মাগরিবের নামাযের পূর্বে ইফতার করা, (৩) দ্বিপ্রহরের পরে মেসওয়াক না করা, (৪) রমযান মাসে দান খয়রাত করা, (৫) কোরআন পড়া ও পড়ানো এবং (৬) মসজিদে এতেকাফ করা; বিশেষতঃ শেষ দশ দিনে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) রমযানের শেষ দশ দিন খুব এবাদত করতেন- নিজেও মেহনত করতেন এবং পরিবারের লোকজনকেও মেহনত করাতেন। কারণ, এই দশ দিনের মধ্যে শবে কদর রয়েছে। এই দশ দিন নিরন্তর এতেকাফ করা উত্তম। এতেকাফের নিয়ত করার পর শরীয়তসম্মত প্রয়োজন ব্যতিরেকে মসজিদ থেকে বের হলে নিরন্তর এতেকাফ হবে না। যেমন, কোন রোগীকে দেখার জন্যে, সাক্ষ্য দেয়ার

জন্যে, জানাযায় শরীক হওয়ার জন্যে এবং যিয়ারত করার জন্যে বের হওয়া। প্রস্রাব পায়খানার জন্যে বের হলে কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু ওযু ব্যতীত অন্য কোন কাজে মশগুল হওয়া যাবে না। দেহের কিছু অংশ মসজিদ থেকে বের করলে এতেকাফের নিরন্তরতা ভঙ্গ হবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের মস্তক আয়েশা (রাঃ)-এর কক্ষে বের করে দিতেন এবং তিনি চিরুনি করে দিতেন।

রোযার আভ্যন্তরীণ শর্তসমূহ

প্রকাশ থাকে যে, রোযার তিনটি স্তর আছে– সাধারণের রোযা, বিশেষ ব্যক্তিগণের রোযা এবং বিশিষ্টতম ব্যক্তিবর্গের রোযা।

সাধারণের রোযা হচ্ছে, উদর ও লজ্জাস্থানকে কামোদ্দীপনা পূর্ণ করা থেকে বিরত রাখা; যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের রোযা হচ্ছে চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, হাত-পা এবং সমস্ত অঙ্গকে গোনাহ থেকে বিরত রাখা এবং বিশিষ্টতম ব্যক্তিবর্গের রোযা হচ্ছে, অন্তরকে দুঃসাহস, পার্থিব চিন্তা এবং আল্লাহ ব্যতীত সকল বিষয় থেকে ফিরিয়ে রাখা। এই প্রকার রোযা আল্লাহ তাআলা ও আখেরাত ছাড়া অন্য বস্তুর চিন্তা এবং সাংসারিক চিন্তার কারণে নষ্ট হয়ে যায়। হাঁ, ধর্ম পালনের জন্যে যতটুকু পার্থিব চিন্তা জরুরী, ততটুকুর চিন্তা রোযা নষ্ট করে না। কেননা, এটা আখেরাতের পাথেয়– দুনিয়ার নয়। এমনকি, বুযুর্গগণ বলেন ঃ যেব্যক্তি দিনের বেলায় এ চিন্তায় ব্যাপৃত হয় যে, ইফতারীর ব্যবস্থা করে নেয়া দরকার, তাকে ভ্রান্ত বলা হবে। কেননা, সে আল্লাহ তাআলার কৃপার উপর ভরসা কম করে এবং তাঁর প্রতিশ্রুত রিযিকে বিশ্বাস কম রাখে। এটা নবী, সিদ্দীক ও নৈকট্যশীলগণের স্তর। আমরা এ স্তরের অধিক বর্ণনা দিতে চাই না। এই রোযা তখন অর্জিত হয়, যখন মানুষ সমস্ত সাহসিকতা সহকারে আল্লাহ তাআলার প্রতি মনোনিবেশ করে, অন্য সবকিছুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং এই আয়াতের বিষয়বস্তু তার উপর আচ্ছন্ন হয়ে যায়–

قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِىْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ -

বল, আল্লাহ, অতঃপর তাদেরকে তাদের ছিদ্রান্বেষা নিয়ে খেলা করতে দাও।

বিশিষ্ট অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের রোযা অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে গোনাহের কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখার মাধ্যমে অর্জিত হয়। ছয়টি বিষয় দ্বারা এই রোযা পূর্ণতা লাভ করে।

(১) দৃষ্টি নত রাখা, মন্দ বিষয়সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয় এমন বিষয় থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মন্দ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা শয়তানের একটি বিষ মিশ্রিত তীর। আল্লাহ তাআলার ভয়ে যে এটা বর্জন করে, আল্লাহ তাকে এমন ঈমান দান করেন, যার মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব করে। হযরত জাবের (রাঃ) রসূলে করীম (সাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ

خمس يفطرن الصائم الكذب والغيبة والنميمة
واليمين الكاذبة والنظرة شهوة -

পাঁচটি বিষয় রোযাদারের রোযা নষ্ট করে দেয়– মিথ্যা বলা, কুটনামি করা, পশ্চাদনিন্দা করা, মিথ্যা কসম খাওয়া এবং কামভাব সহকারে দৃষ্টিপাত করা।

(২) অনর্থক কথাবার্তা, মিথ্যা, পরনিন্দা, অশ্লীলতা, জুলুম, কলহ বিবাদ ইত্যাদি গর্হিত কর্ম থেকে রসনা সংযত রাখা, সাধ্যমত নিরবতা পালন করা এবং যিকির ও তেলাওয়াতে ব্যাপৃত থাকা এটা জিহ্বার রোযা। সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ পরনিন্দা রোযা বিনষ্ট করে। হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণিত আছে– দুটি অভ্যাস রোযা নষ্ট করে– পরনিন্দা ও মিথ্যা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ রোযা ঢাল। তোমাদের কেউ যখন রোযা রাখে, তখন যেন মূর্খোচিত ও অশ্লীল কথা না বলে। কেউ তার সাথে ঝগড়া করলে অথবা গালি দিলে সে যেন বলে দেয়– আমি রোযাদার। এক হাদীসে আছে– রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলে দু'জন মহিলা রোযা রাখে। রোযার শেষ ভাগে তাদের ক্ষুধা ও পিপাসা তীব্র আকার ধারণ করে এবং তারা মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়ে পড়ে। তারা রোযা ভঙ্গের অনুমতি নেয়ার জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে একজনকে প্রেরণ করল। তিনি প্রেরিত লোকের হাতে একটি পেয়ালা দিয়ে বললেন ঃ মহিলাদ্বয়কে বলো, তারা যা খেয়েছে তা যেন এই পেয়ালায় বমি করে

দেয়। একজন মহিলা তাজা রক্ত ও টাটকা মাংস দিয়ে অর্ধেক পেয়ালা ভরে দিল। অপর মহিলাও এসব বস্তু বমি করল। ফলে পেয়ালা কানায় কানায় ভর্তি হয়ে গেল। ব্যাপার দেখে লোকেরা বিস্ময় প্রকাশ করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তারা উভয়েই আল্লাহর হালাল করা বস্তু দ্বারা রোযা রেখেছে এবং হারাম করা বস্তু দ্বারা রোযা নষ্ট করেছে। তারা একে অপরের কাছে বসে পরনিন্দায় মেতে উঠেছে। তাদের এই পরনিন্দাই পেয়ালায় গোশতের আকারে দেখা যাচ্ছে।

(৩) কুকথা শ্রবণ থেকে কর্ণকে বিরত রাখা। কেননা, যেসব কথা বলা হারাম সেগুলো শ্রবণ করাও হারাম। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা মিথ্যা শ্রবণকারী ও হারাম ভক্ষণকারীদের পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন। বলা হয়েছে ঃ

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ـ

অর্থাৎ, তারা মিথ্যা শ্রবণকারী ও হারাম ভক্ষণকারী।

আরও বলা হয়েছে—

لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ـ

তাদের দরবেশ ও আলেমগণ তাদেরকে গোনাহের কথা বলতে এবং হারাম ভক্ষণ করতে নিষেধ করে না কেন?

সুতরাং পরনিন্দা শুনে চুপ থাকা হারাম। আল্লাহ বলেন اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ (তখন তোমরাও তাদের মত।) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ المغتاب والمستمع شريكان فى الاثم ـ (গীবতকারী ও শ্রবণকারী উভয়েই গোনাহে শরীক।)

(৪) হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে খারাপ বিষয় থেকে এবং ইফতারের সময় পেটকে সন্দেহযুক্ত খাদ্য থেকে বিরত রাখা। কেননা, যদি কেউ সারাদিন হালাল থেকে বিরত থাকে এবং হারাম দ্বারা ইফতার করে, তবে তার রোযা কিছুই হয় না। সে সেই ব্যক্তির মত, যে একটি প্রাসাদ তৈরী করে এবং একটি নগরী বিধ্বস্ত করে। কেননা, হালাল খাদ্যের আধিক্যই ক্ষতিকর। এ ক্ষতি হ্রাস করার জন্যে রোযার বিধান।

যেব্যক্তি অনেক ওষুধ সেবনের ক্ষতিকে ভয় করে বিষ পান করে, সে নির্বোধ। হারাম খাদ্য বিষতুল্য, যা ধর্ম বরবাদ করে এবং হালাল খাদ্য ওষুধস্বরূপ, যা কম খাওয়া উপকারী এবং বেশী খাওয়া ক্ষতিকর। রোযার উদ্দেশ্য হালালের ক্ষতি হ্রাস করা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন—

অনেক রোযাদারের রোযায় ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ছাড়া কিছুই লাভ হয় না। কেউ বলেন, যে হারাম দ্বারা ইফতার করে, হাদীসে তাকেই বুঝানো হয়েছে। কারও কারও মতে সে ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে হালাল খাদ্য থেকে বিরত থাকে এবং মানুষের গোশত অর্থাৎ গীবত দ্বারা ইফতার করে, যা হারাম। আবার কেউ কেউ বলেন, যেব্যক্তি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখে না, হাদীসে তাকে বুঝানো হয়েছে।

(৫) ইফতারে হালাল খাদ্য এত বেশী খেতে নেই যাতে পেট স্ফীত হয়ে যায়। কেননা, আল্লাহ তাআলার কাছে হালাল খাদ্য দ্বারা পরিপূর্ণ পেটের চেয়ে অধিক মন্দ পাত্র আর একটিও নেই। এছাড়া সারা দিনের ক্ষুধা ও পিপাসার ক্ষতি ইফতারের সময় পূরণ করে নেয়া হলে মানুষ রোযা দ্বারা শয়তানকে কিরূপে দাবিয়ে রাখবে এবং কামভাবকে কিরূপে চূর্ণ করবে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, রোযার মধ্যে নানা প্রকারের খাদ্যের আয়োজন হয়ে থাকে। সেমতে মানুষের অভ্যাস এই দাঁড়িয়েছে যে, তারা রমযান মাসের জন্যে সব খাদ্য গুছিয়ে রাখে এবং রমযানে এত বেশী খায়, যা অন্য সময় কয়েক মাসেও খায় না। বলাবাহুল্য, রোযার উদ্দেশ্য পেট খালি রাখা এবং কামনা-বাসনাকে চূর্ণ করা, যাতে তাকওয়া শক্তিশালী হয়। কিন্তু সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উদরকে অভুক্ত রাখার পর যখন খাদ্যস্পৃহা অনেক বেড়ে যায়, তখন পেট পুরে ও তৃপ্তি সহকারে সুস্বাদু খাদ্য খেলে নফসের আনন্দ শক্তি আরও দ্বিগুণ হয়ে যায় এবং এমন সব কুবাসনা জাগ্রত হয়, যা রমযান মাস না হলে হয় তো জাগ্রত হত না। মোট কথা, যেসব শক্তি মানুষকে মন্দ কাজের দিকে টেনে নেয়ার ওসিলা এবং শয়তানের হাতিয়ার, সেগুলোকে দুর্বল করা রোযার উদ্দেশ্য। এটা অল্প ভক্ষণ ছাড়া অর্জিত হয় না। অর্থাৎ, রোযার রাতে এতটুকু খাবে, যতটুকু রোযা ছাড়া প্রত্যেক রাতে খাওয়ার অভ্যাস ছিল। রোযা রেখে দ্বিপ্রহর ও রাত্রির খাদ্য এক সাথে খেয়ে ফেললে সেই রোযা দ্বারা কোন উপকার হবে না। ক্ষুধা, পিপাসা ও দৈহিক দুর্বলতা উপলব্ধি করার কারণে

দিনের বেলায় বেশী নিদ্রা না যাওয়া মোস্তাহাব। রাতেও কিছু দুর্বলতা থাকা ভাল, যাতে তাহাজ্জুদ ও ওজিফা সহজসাধ্য হয়। এতে শয়তান মনের আশেপাশে ভিড়তে পারবে না। ফলে মানুষের দৃষ্টিতে উর্ধ্বজগত উদ্ভাসিত হয়ে গেলে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। শবে কদর সেই রাত্রকেই বলে, যাতে উর্ধ্বজগতের কিছু মানুষের কাছে উন্মোচিত হয়ে যায়। যেব্যক্তি অন্তর ও বুকের মধ্যে খাদ্যের আড়াল সৃষ্টি করে, সে উর্ধ্ব জগতের অন্তরালে থেকে যায়।

(৬) ইফতারের পর মনে একাধারে আশা ও ভয় এবং সন্দেহ থাকা। কেননা, একথা কারও জানা নেই যে, রোযাদারের রোযা কবুল হয়েছে কিনা এবং সে নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিনা। প্রত্যেক এবাদত শেষে এমনি ধরনের অবস্থা থাকা ভাল। বর্ণিত আছে, হযরত হাসান বসরী ঈদের দিন একদল লোকের কাছ দিয়ে গমন করলেন, যারা তখন হাস্যরত ছিল। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা রমযান মাসকে দৌড়ের মাঠ করেছেন, যাতে সকল মানুষ তার আনুগত্যের জন্যে মাঠে দৌড় দেয়। কিছু লোক তো অগ্রসর হয়ে মনযিলে মকছুদে পৌঁছে গেছে। আর কিছু লোক পেছনে থেকে নিরাশ হয়েছে। যেদিন অগ্রগামীরা তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছেছে এবং বাতিলপন্থীরা বঞ্চিত রয়েছে, সেদিন যারা হাসি-তামাশা করে, তাদের প্রতি বিস্ময় লাগে। আল্লাহর কসম, প্রকৃত পরিস্থিতি ফুটিয়ে তোলা হলে মকবুল ব্যক্তিরা আনন্দের আতিশয্যে ক্রীড়া-কৌতুক বর্জন করবে এবং প্রত্যাখ্যাত ব্যক্তিরা দুঃখের আতিশয্যে হাস্য, রসিকতা থেকে বিরত থাকবে। আহনাফ ইবনে কায়স (রাঃ)-কে কেউ বলল ঃ আপনি বুড়ো মানুষ। রোযা আপনাকে দুর্বল করে দেয়। এ জন্যে কোন উপায় করা আপনার জন্যে মঙ্গলজনক। তিনি বললেন ঃ আমি একটি দীর্ঘ সফরের জন্যে রোযাকে প্রস্তুত করছি। আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে সবর করা তাঁর আযাবে সবর করার তুলনায় অনেক সহজ। এ পর্যন্ত রোযার ছয়টি আভ্যন্তরীণ বিষয় বর্ণিত হল।

যেব্যক্তি কেবল উদর ও লজ্জাস্থানের কামনা-বাসনা থেকে বিরত থাকে এবং এগুলো পালন করে না, ফেকাহবিদগণ তাদের রোযা জায়েয বলে থাকেন। এখন যদি প্রশ্ন হয়, ফেকাহবিদগণ যে রোযাকে জায়েয বলেন, আপনি তা অশুদ্ধ বলেন কেন, তবে আমার পক্ষ থেকে এর

জওয়াব হচ্ছে, ফেকাহবিদগণ বাহ্যদর্শী। তাঁরা এমন দলীল দ্বারা বাহ্যিক শর্তাবলী প্রমাণ করেন, যা বাতেনী শর্তাবলীর মধ্যে আমাদের বর্ণিত দলীলের তুলনায় নেহায়েত দুর্বল। বিশেষতঃ পরনিন্দা, কলহ-বিবাদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে। বাহ্যদর্শী ফেকাহবিদগণকে এমন বিধান দিতে হয়, যাতে গাফেল ও সংসারাসক্ত ব্যক্তিরাও দাখিল থাকতে পারে। তাই বহ্যিক শর্তাবলী দৃষ্টে অনেক বিষয়কে তাদের শুদ্ধ বলতে হয়। কিন্তু আখেরাতবিদগণের মতে শুদ্ধ হওয়ার অর্থ কবুল হওয়া। আর কবুল হওয়ার মানে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা। তাঁরা বলেন ঃ রোযার উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার একটি গুণ ক্ষুধা পিপাসা থেকে মুক্ত হওয়াকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করা এবং কামনা-বাসনা চূর্ণ করার ব্যাপারে যথাসাধ্য ফেরেশতাগণের অনুসরণ করা। মানুষের মর্তবা চতুষ্পদ জন্তুর মর্তবা থেকে উর্ধ্বে; কেননা, মানুষ বিবেকের সাহায্যে তার কামনা-বাসনা চূর্ণ করতে সক্ষম। কিন্তু চেষ্টার মাধ্যমে কামনা বাসনা নিয়ন্ত্রণ করতে হয় বলে মানুষের মর্তবা ফেরেশতাগণের নীচে। এ কারণেই মানুষ যখন কামনা-বাসনায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, তখন সে اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ তথা নিম্নতমদের স্তরে নেমে যায় এবং চতুষ্পদ জন্তুর কাতারে শামিল হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যখন মানুষ কামনা-বাসনার মূলোৎপাটন করতে সক্ষম হয়, তখন اَعْلٰى عِلِّيِّيْنَ তথা মর্যাদার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে ফেরেশতাগণের স্তরে পৌঁছে যায়। ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী। যে লোক তাদের অনুসরণ করে এবং তাদের মত অভ্যাস গড়ে তোলে, সে-ও তাদের মত আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী হয়ে যায়। এই নৈকট্য স্থান ও দূরত্বের দিক দিয়ে নয়; বরং গুণাবলীর দিক দিয়ে। মনস্তত্ত্ববিদদের মতে রোযার মূল উদ্দেশ্য যখন এই, তখন দ্বিপ্রহরের খাদ্য দেরী করে সন্ধ্যার খাদ্যের সাথে একেবারে খেয়ে নিলে এবং সারাদিন কামনা বাসনায় নিমজ্জিত থাকলে কি উপকার হবে? এরূপ রোযা দ্বারা উপকার হলে এই হাদীসের অর্থ কি যে, অনেক রোযাদারের রোযা ক্ষুধায় তৃষ্ণা ছাড়া কিছুই অর্জিত হয় না? এ কারণেই জনৈক আলেম বলেন ঃ অনেক রোযাদার রোযাখোর এবং অনেক রোযাখোর রোযাদার হয়ে থাকে। অর্থাৎ, রোযাখোর হয়েও রোযাদার তারা, যারা আপন

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহ থেকে মুক্ত রেখে পানাহার করে এবং রোযাদার হয়েও রোযাখোর তারা, যারা ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত তো থাকে; কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহ থেকে বিরত রাখে না। রোযার অর্থ ও মূল লক্ষ্য অবগত হওয়ার পর জানা গেল, যেব্যক্তি পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বেঁচে থাকে; কিন্তু গোনাহের কাজ করে রোযা নষ্ট করে দেয়, সে সেই ব্যক্তির মত, যে ওযুর মধ্যে ওযুর অঙ্গ তিন বার মাসেহ করে নেয়। এখানে সে বাহ্যতঃ তিন বার মাসেহ করল; কিন্তু আসল উদ্দেশ্য যে ধৌত করা ছিল, তা ছেড়ে দিল। এরূপ ব্যক্তির নামায অজ্ঞতার কারণে তার মুখের উপর প্রত্যাখ্যাত হবে। যেব্যক্তি খেয়ে রোযা নষ্ট করে এবং আপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহের কাজ থেকে বিরত রাখে, সে সেই ব্যক্তির মত, যে ওযুর মধ্যে এক একবার অঙ্গ ধৌত করে। তার নামায ইনশাআল্লাহ মকবুল। কেননা, সে আসল ফরয আদায় করেছে, যদিও ফযীলত বর্জন করেছে। আর যেব্যক্তি পানাহার বর্জন করে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারাও রোযা রাখে অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহের কাজ থেকে বিরত রাখে, সে সেই ব্যক্তির মত, যে ওযুর মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গ তিন বার ধৌত করে। সে আসল ও ফযীলত উভয়টি অর্জন করেছে, যা পূর্ণতার স্তর।

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ নিশ্চয় রোযা একটি আমানত। তোমাদের প্রত্যেকের উচিত এই আমানতের হেফাযত করা। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا -

(আল্লাহ আদেশ করেন, তোমরা আমানত আমানতের মালিকদের কাছে পৌঁছে দাও।) আয়াত পাঠ শেষে তিনি আপন কান ও চোখের উপর হাত রেখে বললেন ঃ কানে শুনা এবং চোখে দেখা আমানত। যদি শুনা ও দেখা রোযার অন্যতম আমানত না হত, তবে তিনি কখনও বলতেন না যে, কেউ বিবাদ করতে চাইলে বলে দেবে– আমি রোযাদার। অর্থাৎ, আমি আমার জিহ্বা আমানত রেখেছি। আমি তার হেফাযত করব। তোমাকে জওয়াব দিয়ে এই হেফাযত কিরূপে নষ্ট করব?

নফল রোযা

প্রকাশ থাকে যে, উত্তম দিনে রোযা রাখা উত্তম হয়ে থাকে। উত্তম দিনসমূহের মধ্যে কতক সম্বৎসরের মধ্যে, কতক প্রত্যেক মাসে এবং কতক প্রতি সপ্তাহে পাওয়া যায়। সম্বৎসরের মধ্যে যেসব দিন পাওয়া যায়, সেগুলো হচ্ছে আরাফার দিন, আশুরার দিন, যিলহজ্জের প্রথম দশ দিন ও মহররমের দশ দিন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) শা'বান মাসে এত বেশী রোযা রাখতেন যে, মনে হত তাও যেন রমযান মাস। এক হাদীসে আছে– রমযানের রোযার পর উত্তম রোযা হচ্ছে মহররমের রোযা। এর কারণ, মহররম বছরের প্রথম মাস। এ মাসকে সৎ কাজ দ্বারা পরিপূর্ণ করলে সারা বছর এর বরকত আশা করা যায়। এক হাদীসে আছে– মহররম মাসে একদিন রোযা রাখা অন্য মাসের ত্রিশ রোযার চেয়েও উত্তম। রমযান মাসে একদিন রোযা রাখা মহররমে ত্রিশ রোযার চেয়ে উত্তম। এক হাদীসে আছে– যেব্যক্তি মহররম মাসে তিন দিন অর্থাৎ বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবারে রোযা রাখে, তার প্রত্যেক রোযার বিনিময়ে সাতশ' বছরের এবাদতের সওয়াব লেখা হয়। এক হাদীসে আছে– শাবানের অর্ধেকের পর রমযান পর্যন্ত কোন রোযা নেই। এ কারণেই রমযানের পূর্বে কিছু দিন রোযা না রাখা উত্তম। শাবানের রোযার সাথে রমযানের রোযা মিলিয়ে দেয়াও জায়েয। কারণ রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার এরূপও করেছেন। কোন কোন সাহাবী সম্পূর্ণ রজব মাস রোযা রাখা মাকরূহ বলেছেন, যাতে রমযান মাসের মত না হয়ে যায়। মোট কথা, যিলহজ্জ, মহররম রজব ও শাবান উত্তম মাস। এক হাদীসে আছে, যিলহজ্জের দশ দিনের তুলনায় এমন কোন দিন নেই, যাতে আমল করলে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় হয়। এর এক দিনের রোযা সারা বছরের রোযার সমান। এর এক রাত্রির জাগরণ শবে কদরে জাগরণের সমান। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ আল্লাহর পথে জেহাদ করাও কি এই দিনের আমলের সমান নয়। তিনি বললেন ঃ জেহাদও সমান নয়, তবে যদি তার ঘোড়া মারা যায় এবং সে নিজে শহীদ হয়।

যেসকল দিন মাসের মধ্যে উত্তম পাওয়া যায়, সেগুলো হচ্ছে মাসের শুরু, মধ্যবর্তী ও শেষ দিনসমূহ। মাসের মধ্যবর্তী দিনগুলোকে আইয়ামে

বীয বলা হয়। এগুলো হচ্ছে চান্দ্রমাসের তের, চৌদ্দ ও পনর তারিখ। সপ্তাহের উত্তম দিন হচ্ছে সোম, বৃহস্পতি ও শুক্রবার। উল্লিখিত উত্তম দিনগুলোতে রোযা রাখা ও বেশী পরিমাণে খয়রাত করা মোস্তাহাব। এসব দিনের বরকতে আমলের সওয়াব অনেক বেড়ে যায়।

সর্বকালের রোযার মধ্যে আরও অতিরিক্ত দিনসহ এ সকল দিনও শামিল। কিন্তু এ ব্যাপারে সাধককুলের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ সর্বকালের রোযা মাকরূহ বলেন। হাদীস থেকে তাই বুঝা যায়। সর্বকালীন রোযার এক প্রকার হচ্ছে দুই ঈদের দিন এবং তাশরীকের দিনগুলোতেও রোযা রাখা। একে সওমে দাহর বলা হয়। এই প্রকার রোযা যে মাকরূহ, তা বলাই বাহুল্য। এ ছাড়া সর্বকালীন রোযার মধ্যে রোযার বিরতি জনিত সুন্নত, থেকে মুখ ফেরানো হয় এবং রোযাকে নিজের উপর জরুরী করে নেয়া হয়। অথচ আল্লাহর পক্ষ থেকে রোযা না রাখার যে অনুমতি আছে, তা পালন করা আল্লাহ পছন্দ করেন, যেমন ফরয ও ওয়াজেব পালন করা তিনি পছন্দ করেন। এ কারণেও সর্বকালীন রোযা মাকরূহ। যদি সর্বকালীন রোযা রাখার মধ্যে উপরোক্ত দুটি অনিষ্টের মধ্য থেকে একটিও না হয় এবং সর্বকালীন রোযা রাখার মধ্যে নফসের কল্যাণ জানা যায়, তবে সর্বকালীন রোযা রাখবে। কেননা, অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী সর্বকালীন রোযা রেখেছেন। হযরত আবু মূসা আশআরী (রঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

من صام الدهر كله ضيقت عليه جهنم هكذا -

অর্থাৎ, যেব্যক্তি দাহরের রোযা রাখে, 'জাহান্নামে তার জন্য কোন স্থান থাকে না।

রোযার আর একটি স্তর হচ্ছে অর্ধ দাহরের রোযা রাখা। অর্থাৎ, একদিন রোযা রাখা ও একদিন রোযা না রাখা। এভাবে সারা জীবন রোযা রাখা। এটা নফসের জন্যে অধিক কঠিন। ফলে নফস খুব দমিত হয়। হাদীসে এ রোযার ফযীলত বর্ণিত আছে। এ রোযায় বান্দা একদিন সবর করে ও একদিন শোকর করে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আমার সামনে দুনিয়ার ধন-ভান্ডারের চাবি এবং ভূপৃষ্ঠে সমাহিত ধন-সম্পদ পেশ করা হয়েছে। আমি সেগুলো প্রত্যাখ্যান করে বলেছি ঃ আমি একদিন অভুক্ত থাকব এবং একদিন পেট পুরে আহার করব। যেদিন

পেট পুরে খাব, সেদিন আপনার প্রশংসা করব। আর যেদিন অভুক্ত থাকব, সেদিন আপনার কাছে মিনতি করব। এক হাদীসে আছে–

আমার ভাই দাউদ (আঃ)-এর রোযা উত্তম রোযা ছিল। তিনি একদিন রোযা রাখতেন ও একদিন রোযা রাখতেন না।

জীবনের অর্ধেক দিন রোযা রাখা সম্ভব না হলে এক-তৃতীয়াংশ দিন রোযা রাখবে। অর্থাৎ, একদিন রোযা রাখবে এবং দুদিন রোযা রাখবে না। মাসের প্রথম তিন দিন, আইয়ামে বীযের তিন দিন এবং শেষ তিন দিন রোযা রাখলে এক-তৃতীয়াংশে এবং উত্তম দিনেও রোযা হয়ে যায়। সপ্তাহে সোম, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে রোযা রাখলে এক-তৃতীয়াংশের কিছু বেশী হয়ে যায়।

যেব্যক্তি অন্তরের সূক্ষ্ম অবস্থা বুঝে এবং আপন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখে, কোন কোন সময় চায়, সে সর্বকালে রোযা রাখুক এবং কখনও চায়, সর্বকালে রোযা না রাখুক। আবার কখনও চায়, মাঝে মাঝে রোযা রাখুক। এ কারণেই বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনও এত রোযা রাখতেন যে, লোকেরা মনে করত তিনি আর কখনও রোযা ছাড়বেন না। কখনও এত বেশী দিন রোযাহীন অবস্থায় অতিবাহিত করতেন যে, মানুষ মনে করত, তিনি আর রোযা রাখবেন না। তিনি রাত্রিকালে এত বেশী নিদ্রা যেতেন, মনে করা হত, তাহাজ্জুদের জন্যে গাত্রোত্থান করবেন না। আবার জাগরণও এত বেশী করতেন যে, বলা হত আর নিদ্রা যাবেন না। কোন কোন আলেম নিরন্তর চার দিনের বেশী রোযাহীন অবস্থায় থাকা মাকরূহ বলেছেন। তাঁদের মতে এটা অন্তরকে কঠোর করে, বদভ্যাস সৃষ্টি করে এবং কামনা বাসনার দ্বার উন্মুক্ত করে। বাস্তবে রোযাহীন অবস্থা অধিকাংশ লোকের মধ্যে এ প্রভাবই সৃষ্টি করে। বিশেষতঃ যারা দিনে ও রাতে দু'বার আহার করে, তাদের জন্যে এটা খুবই ক্ষতিকর।

সপ্তম অধ্যায়

হজ্জের তাৎপর্য

ইসলামের রোকনসমূহের মধ্যে হজ্জ সারা জীবনের এবাদতের সৌন্দর্য ও আমলের পরিণাম এবং ইসলাম তথা ধর্মের পূর্ণতা। হজ্জ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেছেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۔

অর্থাৎ, অদ্য আমি তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম, আমার নেয়ামত তোমাদের জন্যে সম্পূর্ণ করলাম এবং ধর্ম হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্যে পছন্দ করলাম।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ সম্পর্কে এরশাদ করেন ঃ

যেব্যক্তি হজ্জ না করে মারা যায়, সে ইহুদী হয়ে মরুক অথবা খ্রীস্টান হয়ে মরুক, তাতে কিছু আসে যায় না। সুতরাং এমন এবাদতের মাহাত্ম্য বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না, যা না হলে ধর্ম অপূর্ণ থেকে যায় এবং যার বর্জনকারী ইহুদী ও খ্রীস্টানের সমান হয়ে যায়। সেমতে এই মহান রোকনের ব্যাখ্যা, আরকান, সুনান, মোস্তাহাব ও ফযীলত বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করা আবশ্যক।

হজ্জের ফযীলত

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ۔

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা করে দাও যে, তারা তোমার কাছে পদব্রজে এবং কৃশকায় উটের পৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত থেকে আগমন করবে।

হযরত কাতাদাহ (রাঃ) এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে হজ্জের ঘোষণা করতে বললেন, তখন তিনি সজোরে বললেন ঃ হে লোকসকল! আল্লাহ তাআলা একটি গৃহ নির্মাণ করেছেন। তোমরা এর হজ্জ কর। আল্লাহ তাআলা তাঁর এই কণ্ঠ প্রত্যেক এমন ব্যক্তির কানে পৌঁছে দিলেন, যাদের সম্পর্কে তিনি কেয়ামত পর্যন্ত জানতেন যে, তারা হজ্জ করবে। আল্লাহ আরও বলেন ঃ لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ (তারা যেন তাদের উপকারের স্থানে পৌঁছে)। কতক তফসীরকারের মতে উপকারের স্থান হচ্ছে হজ্জ মওসুমের ব্যবসা-বাণিজ্য ও আখেরাতের সওয়াব। আল্লাহ তাআলা কোরআন পাকে শয়তানের এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন–

لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ۔

অর্থাৎ, আমি মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকব।

কতক তফসীরবিদ বলেন, এখানে সরল পথ বলে মক্কা মোয়াযযমার পথ বুঝানো হয়েছে। শয়তান মানুষকে হজ্জ করতে নিষেধ করার উদ্দেশে এ পথে বসে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

যেব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ্জ করে, অতঃপর শ্লীলতা হানি না করে ও পাপাচার না করে, সে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের মত গোনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়। তিনি আরও বলেন ঃ শয়তানকে আরাফার দিনের চেয়ে বেশী অন্য কোন দিন অধিক লাঞ্ছিত, অধিক বিতাড়িত, অধিক হেয় ও অধিক ক্রুদ্ধ দেখা যায় না। এর কারণ আল্লাহর রহমতের অবতরণ এবং বড় গোনাহসমূহ ক্ষমাকরণ সে স্বচক্ষে দেখতে পায়। কথিত আছে, কতক গোনাহ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান ব্যতীত মাফ হয় না। হযরত ইমাম জাফর (রহঃ) একে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তি বলেও সনদ সহকারে উল্লেখ করেছেন। জনৈক নৈকট্যশীল কাশফবিশিষ্ট বুযুর্গ বর্ণনা করেন, অভিশপ্ত ইবলীস মানুষের আকৃতি ধারণ করে একদিন তাঁর কাছে আগমন করে। তিনি তাকে ক্ষীণ দেহ, ফ্যাকাসে বর্ণ, ক্রন্দনরত ও কোমর ভাঙ্গা অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোর কান্নার কারণ কি? ইবলীস বললঃ হাজীগণ আল্লাহকে উদ্দেশ করেই বেরিয়ে পড়েছে। কোন ব্যবসা বাণিজ্য

তাদের লক্ষ্য নয়। যদি আল্লাহ তাদেরকে বঞ্চিত না করেন, তবেই তো আমার সর্বনাশ। এ দুঃখেই আমি কাঁদছি। বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোর ক্ষীণদেহী হওয়ার কারণ কি? সে বলল ঃ আল্লাহর পথে ঘোড়ার চেঁচামেচি আমাকে ক্ষীণ করে দিয়েছে। ঘোড়াগুলো আমার পথে চেঁচামেচি করলে আমি আনন্দিত হতাম। বুযুর্গ বললেন ঃ তোকে বিবর্ণ দেখা যাচ্ছে কেন? সে বলল ঃ আল্লাহর আনুগত্যে মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা আমাকে বিবর্ণ করে দিয়েছে। তারা গোনাহের কাজে পরস্পরে সহযোগিতা করলে আমার কাছে পছন্দনীয় কাজ হত। বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোর কোমর ভেঙ্গে গেল কেন? ইবলীস বলল ঃ বান্দার এই দোয়ার কারণে যে, ইলাহী, আমি তোমার কাছে শুভ পরিণাম কামনা করি। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি হজ্জ অথবা ওমরা করার নিয়তে গৃহ থেকে বের হয়, অতঃপর মারা যায়, তার জন্যে হজ্জকারী ও ওমরাকারীর সওয়াব কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। আর যেব্যক্তি দুই হেরেম শরীফের যেকোন একটিতে মারা যায়, তাকে হিসাব-নিকাশের জন্যে পেশ না করেই বলা হবে— জান্নাতে প্রবেশ কর।

এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ মকবুল হজ্জ দুনিয়া ও দুনিয়াস্থিত সবকিছু থেকে উত্তম এবং মকবুল হজ্জের প্রতিদান একমাত্র জান্নাত। আরও বলা হয়েছে, যারা হজ্জ ও ওমরা করে, তারা আল্লাহ তাআলার দূত ও মেহমান। তারা কিছু যাঞ্চা করলে তিনি তা দান করেন, মাগফেরাত চাইলে মাগফেরাত করেন, দোয়া করলে কবুল করেন এবং সুপারিশ করলে মঞ্জুর করেন। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

সর্ববৃহৎ গোনাহগার সে ব্যক্তি, যে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করেও ধারণা করে যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেননি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ কা'বা গৃহের উপর প্রত্যহ একশ' বিশটি রহমত নাযিল হয়। ষাটটি তওয়াফকারীদের জন্যে, চল্লিশটি নামায আদায়কারীদের জন্যে এবং বিশটি দর্শকদের জন্যে। এক হাদীসে আছে, বায়তুল্লাহর তওয়াফ বেশী বেশী কর। এটি বড় এবাদত। কেয়ামতের দিন আমলনামায় একে পাবে এবং এর সমান ঈর্ষাযোগ্য আর কোন আমল পাবে না। এ কারণেই হজ্জ ও ওমরা ছাড়া প্রথমেই তওয়াফ করা

মোস্তাহাব। এক হাদীসে আছে, যেব্যক্তি নগ্নপদে ও নগ্ন দেহে সাত চক্কর তওয়াফ করে, সে যেন একটি গোলাম মুক্ত করে। আর যেব্যক্তি সাত চক্কর তওয়াফ বৃষ্টির মধ্যে করে, তার পূর্ববর্তী গোনাহ মাফ করা হয়। কথিত আছে, আরাফাতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা কোন বান্দার গোনাহ মাফ করলে যেব্যক্তি সেই বান্দার স্থানে পৌঁছে, তারও মাগফেরাত করা হয়। জনৈক পূর্ববর্তী বুযুর্গ বলেন ঃ আরাফার দিন শুক্রবার পড়লে আরাফাতে উপস্থিত সকলকে আল্লাহ তাআলা মাগফেরাত দান করেন। যে শুক্রবারে আরাফা পড়ে, সেই দিনটি দুনিয়ার সকল দিনের চেয়ে উত্তম। এদিনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিদায় হজ্জ করেন এবং তাঁর আরাফাতের ময়দানে থাকা অবস্থায় এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا -

অর্থাৎ, আমি তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম, আমার নেয়ামত তোমাদের জন্যে সম্পূর্ণ করলাম এবং ধর্ম হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্যে মনোনীত করলাম।

আহলে কিতাবের বক্তব্য ছিল— যদি এই আয়াত আমাদের উপর নাযিল হত, তবে যেদিন নাযিল হত, সেদিনকে আমরা ঈদ করে নিতাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, এ আয়াতটি দু'ঈদের দিনে নাযিল হয়েছে; অর্থাৎ আরাফা ও শুক্রবার দিনে। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত ছিলেন। এক হাদীসে রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

হে আল্লাহ! হাজীকে ক্ষমা কর এবং হাজী যার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাকেও ক্ষমা কর। বর্ণিত আছে, আলী ইবনে মোয়াফফাক (রহঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে কয়েকটি হজ্জ করেন। তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি আমাকে বলছেন ঃ হে ইবনে মোয়াফফাক, তুমি আমার পক্ষ থেকে হজ্জ করেছ? আমি আরজ করলামঃ জী হাঁ। তিনি বললেন ঃ তুমি আমার পক্ষ থেকে লাব্বায়কা বলেছ? আমি আরজ করলাম ঃ জী হাঁ। তিনি বললেন ঃ এর প্রতিদান আমি তোমাকে কেয়ামতের দিন দেব। মানুষ যখন হিসাব-নিকাশের

কঠোরতা ভোগ করতে থাকবে, তখন আমি হাত ধরে তোমাকে জান্নাতে দাখিল করে দেব। মুজাহিদ ও অন্য আলেমগণ বলেন ঃ হাজীগণ যখন মক্কা মোয়াযযমায় আসে, তখন ফেরেশতারা উষ্ট্রারোহীদেরকে সালাম করে, গাধায় আরোহীদের সাথে করমর্দন করে এবং যারা পায়ে হেঁটে আসে, তাদের সাথে কোলাকুলি করে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি রমযানের পরে মারা যায় অথবা জেহাদের পরে অথবা হজ্জের পরে, সে শহীদ হয়ে মারা যায়। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, হাজীদের গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়। যিলহজ্জ, মহররম, সফর ও রবিউল আউয়ালের বিশ তারিখ পর্যন্ত তারা যাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করে তাদেরকেও মাফ করে দেয়া হয়। পূর্ববর্তী মনীষীগণের রীতি ছিল, তাঁরা গাজীদেরকে বিদায় দেয়ার জন্যে সঙ্গে যেতেন এবং হাজীদেরকে আনার জন্যে এগিয়ে যেতেন। তাঁরা তাঁদের চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে কপালে চুম্বন করতেন এবং যে পর্যন্ত হাজীরা গোনাহে লিপ্ত না হত, তাঁদের দোয়া চাইতেন।

আলী ইবনে মোয়াফফাক বলেন ঃ আমি এক বছর হজ্জে আরাফার রাতে মসজিদে খায়ফে অবস্থান করলাম। স্বপ্নে দেখলাম, দু'জন ফেরেশতা আকাশ থেকে সবুজ পোশাক পরিহিত অবস্থায় অবতরণ করলেন। তাদের একজন অপরজনকে 'আবদুল্লাহ' বলে ডাক দিলে অপরজন বলল ঃ লাব্বায়িক। প্রথম ফেরেশতা জিজ্ঞেস করল ঃ তুমি কি জান এ বছর কতজন লোক আমাদের পালনকর্তার গৃহের হজ্জ করেছে? দ্বিতীয় জন বলল ঃ আমি জানি না। প্রথম জন বলল ঃ এবার ছয় লাখ লোক হজ্জ করেছে। এখন তুমি বলতে পার কি তাদের মধ্যে কতজনের হজ্জ কবুল হয়েছে? দ্বিতীয় জন বলল ঃ আমার জানা নেই। প্রথম জন বলল ঃ তাদের মধ্যে মাত্র ছয় জনের হজ্জ কবুল হয়েছে। একথা বলার পর উভয় ফেরেশতা আকাশের দিকে উঠে আমার দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল। আমি ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় জাগ্রত হলাম। এক নিদারুণ দুঃখ আমায় চেপে বসল। আমি নিজের কথা চিন্তা করে মনে মনে বললাম ঃ যখন ছয় জনেরই মাত্র হজ্জ কবুল হয়েছে, তখন আমি তাদের মধ্যে কোথায় থাকব। যখন আমি আরাফা থেকে ফিরে এসে মাশআরে হারামের নিকটে রাত্রি যাপন করলাম, তখন এ চিন্তায়ই বিভোর ছিলাম

যে, এত বিপুল সংখ্যক লোকের মধ্যে মাত্র এই কয়েকজনের হজ্জ কবুল হল! চিন্তার মধ্যেই আমি নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। আবার স্বপ্নে দেখলাম, সেই দুই ফেরেশতা পূর্বেকার আকার আকৃতিতে অবতরণ করল এবং একজন অপরজনকে ডেকে পূর্বের কথাবার্তার পুনরাবৃত্তি করল। অতঃপর একজন বলল ঃ তুমি কি জান অদ্য রাতে আমাদের পরওয়ারদেগার কি আদেশ দিয়েছেন? দ্বিতীয় ফেরেশতা বলল ঃ আমি জানি না। প্রথম জন বলল ঃ আল্লাহ্ তাআলা ছয় জনের প্রত্যেককে এক এক লাখ মানুষ দিয়েছেন, অর্থাৎ এই ছয় জনের সুপারিশ ছয় লাখ মানুষের জন্যে মঞ্জুর হবে। ইবনে মোয়াফফাক্ বলেন ঃ এর পর যখন আমার চক্ষু খুলল, তখন আমার আনন্দ ছিল বর্ণনাতীত।

অন্য এক বর্ণনায় ইবনে মোয়াফফাক বলেন ঃ এক বছর হজ্জে যখন আমি সকল ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করলাম, তখন যাদের হজ্জ নামঞ্জুর হয়েছে, তাদের কথা চিন্তা করলাম। সেমতে আমি দোয়া করলাম ইলাহী, আমি আমার হজ্জ ও তার সওয়াব সেই ব্যক্তিকে দান করলাম, যার হজ্জ কবুল হয়নি। ইবনে মোয়াফফাক বলেন, রাতে আমি আল্লাহ জাল্লা শানুহুকে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি বলছেন ঃ হে আলী, তুমি আমার সামনে দানশীলতা প্রকাশ করছ! জেনে রাখ, আমি দানশীলতা ও দাতাদেরকে সৃষ্টি করেছি। সকল দাতার চেয়ে অধিক দাতা ও দানশীল আমিই। সারা জাহানের মানুষের তুলনায় দান করার যোগ্যতা আমার বেশী। আমি যাদের হজ্জ কবুল করিনি, তাদেরকে এমন লোকদের যিম্মায় দিয়েছি যাদের হজ্জ কবুল করেছি।

বায়তুল্লাহ ও মক্কা মোয়ায্যমার ফযীলত

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন, প্রতিবছর অনূন্য ছয় লাখ মানুষ এ গৃহের হজ্জ করবে। কম হলে আল্লাহ ফেরেশতা দ্বারা এ সংখ্যা পূর্ণ করে দেবেন। কেয়ামতের দিন বায়তুল্লাহ নববধূর ন্যায় হাশরের ময়দানে উত্থিত হবে। দুনিয়াতে যাঁরা হজ্জ করেছেন বা করবেন তাঁরা এর গেলাফে ঝুলে থাকবেন এবং চারপাশে চলবেন। অবশেষে বায়তুল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করবে। হাজীরাও সাথে জান্নাতে দাখিল হবে।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ হাজারে আসওয়াদ (কাল পাথর)

জান্নাতের ইয়াকূতসমূহের মধ্যে একটি ইয়াকূত। কেয়ামতের দিন এটি দু'চক্ষুবিশিষ্ট হয়ে উত্থিত হবে। তার একটি জিহ্বাও থাকবে, তদ্দ্বারা সে সেই ব্যক্তির জন্যে সাক্ষ্য দেবে, যে তাকে নিষ্ঠা ও সততা সহকারে চুম্বন করে থাকবে। রসূলুল্লাহ্ হাজারে আসওয়াদকে বার বার চুম্বন করতেন। বর্ণিত আছে, তিনি এর উপর সেজদাও করেছেন। সওয়ারীতে বসে তওয়াফ করলে তিনি আপন ছড়ির অগ্রভাগ পাথরে স্পর্শ করে তাতে চুম্বন করতেন। হযরত ওমর (রাঃ) একবার এই পাথরটি চুম্বন করার পর বললেন ঃ আমি জানি, তুমি একটি পাথর বৈ আর কিছু নও। কারও ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা তোমার নেই। যদি আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তবে আমি কখনও তোমাকে চুম্বন করতাম না। অতঃপর তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করলেন। এর পর পেছন ফিরে হযরত আলী (রাঃ)-কে দেখতে পেয়ে বললেন ঃ আবুল হাসান, এটা অশ্রুপাত করার স্থান। এখানে দোয়া কবুল হয়। হযরত আলী (রাঃ) বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, এই পাথর ক্ষতি ও উপকার করে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কিভাবে? হযরত আলী বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা যখন আদম সন্তানদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেন, তখন একটি লিপি লেখে এই পাথরকে খাইয়ে দেন। সুতরাং এই পাথর ঈমানদারের জন্যে অঙ্গীকার পূর্ণ করার এবং কাফেরদের জন্য অঙ্গীকার ভঙ্গ করার সাক্ষ্য দেবে। কথিত আছে, এই পাথর চুম্বন করার সময় এই দোয়া পাঠ করা হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি এ কাজ করছি তোমার প্রতি ঈমানের কারণে, তোমার কিতাব সত্যায়ন করা ও তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্যে। এতে সেই অঙ্গীকারই বুঝানো হয়েছে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে- মক্কা মোয়াযযমায় একদিন রোযা রাখা এক লাখ রোযার সমান। এক দেরহাম খয়রাত করা এক লাখ দেরহাম খয়রাত করার সমান। এমনিভাবে প্রত্যেক পুণ্য কাজ এক লাখ পুণ্য কাজের সমান। কথিত আছে- সাত চক্করের একটি তওয়াফ এক ওমরার সমান এবং তিনটি ওমরা এক হজ্জের সমান। এক হাদীসে আছে-

عمرة فى رمضان كحجة معى -

রমযানে একটি ওমরা করা আমার সাথে এক হজ্জ করার সমান। আর এক হাদীসে আছে-

মহানবী (সঃ) বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমার কবরের মাটি বিদীর্ণ হবে। অতঃপর আমি বাকী নামক গোরস্থানে যাব এবং তাদের হাশর আমার সাথে হবে। এর পর আমি মক্কাবাসীদের কাছে যাব এবং আমার হাশর দুই হেরেমের মাঝখানে হবে। এক হাদীসে আছে ঃ হযরত আদম (আঃ) যখন হজ্জের ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করলেন, তখন ফেরেশতারা তাঁর সাথে সাক্ষাত করে বলল ঃ হে আদম! আপনার হজ্জ কবুল হয়েছে। আমরা এ গৃহের হজ্জ দু'হাজার বছর পূর্বে করেছি। এক রেওয়ায়েতে আছে- আল্লাহ তাআলা প্রতি রাত্রে পৃথিবীবাসীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। সকলের অগ্রে হেরেমের অধিবাসীদেরকে এবং তাদের মধ্যে কা'বা মসজিদের লোকদেরকে দেখেন। এমতাবস্থায় যাকে তওয়াফ করতে দেখেন তাকে ক্ষমা করে দেন, যাকে নামায পড়তে দেখেন তাকে মাগফেরাত দান করেন এবং যাকে কেবলামুখী দন্ডায়মান দেখেন তাকেও মাগফেরাত দান করেন। কথিত আছে- প্রত্যহ যখন সূর্য অস্ত যায় তখন বায়তুল্লাহর তওয়াফ একজন আবদাল অবশ্যই করেন এবং প্রত্যেক রাত্রির প্রভাতে একজন আওতাদ ব্যক্তি কাবার তওয়াফ করেন। এ তওয়াফ না থাকা পৃথিবী থেকে কাবার উঠে যাওয়ার কারণ হবে এবং মানুষ সকালে গাত্রোত্থান করে দেখবে, কাবার স্থান শূন্য। সেখানে কাবার কোন চিহ্ন নেই। এটা তখন হবে, যখন সাত বছর পর্যন্ত কাবার হজ্জ কেউ করবে না। এরপর কোরআনের অক্ষর মাসহাফ থেকে মুছে যাবে। মানুষ সকালে দেখবে কোরআনের পাতা অক্ষর শূন্য সাদা হয়ে আছে। এর পর মানুষের মন থেকে কোরআন মিটিয়ে ফেলা হবে। ফলে তার একটি শব্দও কারও মনে থাকবে না। এর পর মানুষ কবিতা, রাগ-রাগিনী ও জাহেলিয়াত যুগের কেস্সা-কাহিনীতে মেতে থাকবে। দাজ্জাল বের হবে এবং হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণ করে তাকে হত্যা করবেন। কেয়ামত তখন এত নিকটবর্তী হবে যেমন, গর্ভ ধারণের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর গর্ভবতীর যে কোন সময় সন্তান প্রসব আশা করা যায়। এক হাদীসে আছে- এ গৃহটি তুলে নেয়ার পূর্বে বেশী পরিমাণে এর তওয়াফ করে নাও। কারণ, দুবার এ গৃহ বিধ্বস্ত করা হয়েছে। তৃতীয় বার তুলে নেয়া হবে। হযরত আলীর

(রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন– যখন আমি দুনিয়াকে ধ্বংস করতে চাইব, তখন নিজের ঘর থেকে শুরু করব। প্রথমে একে ধ্বংস করে পরে দুনিয়া ধ্বংস করব।

মক্কা মোয়াযযমায় অবস্থান ঃ সাবধানী আলেমগণ তিন কারণে মক্কা মোয়াযযমায় অবস্থান অনুচিত মনে করেন। প্রথমতঃ তাঁরা বেশী দিন অবস্থানের কারণে বিতৃষ্ণভাব এবং তার দৃষ্টিতে মক্কা শরীফের মর্যাদাও অন্যান্য শহরের সমান হয়ে যাওয়ার আশংকা করেন। কেননা, এটা মক্কার প্রতি সম্মানের ক্ষেত্রে অন্তরের উষ্ণতা লাঘবে প্রভাব বিস্তার করে। এ কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) হজ্জ সমাপ্ত করার পর হাজীগণকে তাকিদ দিয়ে বলতেন ঃ ইয়ামনের অধিবাসীরা, তোমরা ইয়ামনে চলে যাও। সিরিয়ার অধিবাসীরা, তোমরা সিরিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যাও এবং ইরাকীরা ইরাকের পথ ধর। এ জন্যে হযরত ওমর (রাঃ) অধিক তওয়াফ করতে নিষেধ করার ইচ্ছা করেন। তিনি বলেন ঃ আমার আশংকা হয়, না জানি মানুষ এ গৃহকে নিজের বাড়ী ঘরে পরিণত করে নেয়। ফলে এর যথাযথ সম্মান ক্ষুণ্ন হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়তঃ দূরে থাকলে আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং নিকটে আসার জন্যে আকুতি সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তাআলা কাবা গৃহকে مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا (মানুষের সম্মিলন ও শান্তির স্থল) বলেছেন। যেখানে বার বার আসা হয়, তাকে সম্মিলিত স্থল বলা হয়। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যদি তুমি অন্য শহরে অবস্থান কর এবং তোমার মন মক্কার প্রতি উৎসুক থাকে, তবে এটা মক্কায় অবস্থান করে মক্কার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। অন্য একজন বুযুর্গ বলেন ঃ অনেক মানুষ খোরাসানে বসবাস করে; কিন্তু তারা কাবা প্রদক্ষিণকারীদের তুলনায় মক্কার অধিক নিকটবর্তী। কথিত আছে– আল্লাহ তাআলার কিছু নৈকট্যশীল বান্দা এমন রয়েছেন যে, স্বয়ং কাবা গৃহ আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্যে তাদের তওয়াফ করে।

তৃতীয়তঃ মক্কার মাহাত্ম্যের কারণে এখানে গোনাহ করলে আল্লাহর ক্রোধে পতিত হওয়ার আশংকা অধিক। ওয়াহাব রেওয়ায়েত করেন– আমি এক রাতে হাতীমে কাবায় নামাযরত ছিলাম। হঠাৎ কাবা প্রাচীর ও পর্দার মাঝখান থেকে আমার কানে আওয়াজ এল (কাবা বলছে), হে

জিবরাঈল! আমার চার পাশে তওয়াফকারীরা যেসকল বাজে ওযিফা পাঠ করে, তাতে আমার দুঃখ হয়। এই অভিযোগ আমি প্রথমে আল্লাহর কাছে করি, অতঃপর তোমার কাছে করি। যদি তারা এসব বিষয় থেকে বিরত না হয়, তবে আমি এমন এক ঝাঁকুনি দেব যাতে আমার প্রতিটি পাথর সেই পাহড়ে চলে যাবে, যেখান থেকে এগুলো আনা হয়েছিল। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ মক্কা ছাড়া এমন কোন শহর নেই, যেখানে কেবল পাপ কাজের ইচ্ছা করলেই তা পাপ হিসাবে লেখা হয়। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ -

যেব্যক্তি এখানে মন্দ অভিপ্রায়বশতঃ বক্র পথে চলার ইচ্ছা করে, আমি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব। অর্থাৎ, এ শাস্তি কেবল ইচ্ছা করার উপর বলা হয়েছে। কথিত আছে, মক্কায় যেমন সৎ কাজ দ্বিগুণ হয়, তেমনি অসৎ কাজও দ্বিগুণ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতেন ঃ মক্কায় খাদ্য শস্য কিনে গুদামজাত করা এবং দুর্মূল্যের আশায় অপেক্ষা করা হরম শরীফে খোদাদ্রোহিতা করার শামিল। তিনি আরও বলেন ঃ যদি আমি রুকিয়াতে সত্তরটি গোনাহ করি তবে এটা আমার কাছে মক্কায় এক গোনাহ করার চেয়ে লঘু। রুকিয়া মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি মনযিল। এ ভয়ের কারণেই কোন কোন অবস্থানকারীর অবস্থা এই দাঁড়িয়েছিল যে, তাঁরা হরম শরীফের মাটিতে প্রস্রাব-পায়খানা করতেন না; বরং এ জন্যে হরমের বাইরে চলে যেতেন। কেউ কেউ পূর্ণ এক মাস মক্কায় থেকেও আপন পার্শ্ব মাটিতে রাখেননি। মক্কায় অবস্থান নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে কোন কোন আলেম সেখানকার ঘর ভাড়া নেয়া মাকরূহ বলেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, মক্কায় অবস্থান করা যে মাকরূহ, এর কারণ হচ্ছে সেই পবিত্র স্থানের হক আদায় করতে মানুষের অক্ষমতা। সুতরাং আমরা যখন বলি, মক্কায় অবস্থান না করা উত্তম, তখন এর অর্থ, সেখানে অবস্থান করে গোনাহ করা এবং বিতৃষ্ণ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হতে পারে, এত অধিকাল অবস্থান না করা ভাল। এ অর্থ নয় যে, হক আদায় করার পরেও অবস্থান করা মাকরূহ হবে। এটা কিরূপে হতে পারে? মক্কা তো এমন স্থান যেখানে অবস্থান করার আকাঙ্ক্ষা রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেও ব্যক্ত

করেছেন। তিনি যখন মক্কা থেকে মদীনায় গমন করেন, তখন কাবার দিকে মুখ করে বললেন ঃ আল্লাহর ভূপৃষ্ঠে তুমি শ্রেষ্ঠ। সকল স্থানের তুলনায় তুমি আমার কাছে অধিক প্রিয়। যদি আমি তোমার মধ্য থেকে বহিষ্কৃত না হতাম, তবে কখনও তোমাকে ত্যাগ করতাম না। এ ছাড়া কাবা গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করা এবাদত। এমতাবস্থায় এটা কিরূপে সম্ভব যে, এতে অবস্থান না করা অবস্থান করার তুলনায় সর্বাবস্থায় উত্তম হবে?

মদীনা মোনাওয়ারার ফযীলত ঃ মক্কার পরে পৃথিবীর কোন শহর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শহর মদীনা তাইয়েবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। এখানেও আমল দ্বিগুণ হয়। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

আমার এই মসজিদে এক নামায মক্কার মসজিদে হারাম বাদে অন্য সকল মসজিদে এক হাজার নামাযের চেয়েও উত্তম। অনুরূপভাবে মদীনায় প্রত্যেকটি আমল হাজার আমলের সমান। মদীনার পরের স্থান বায়তুল মোকাদ্দাসের। তাতে এক নামায পাঁচশ' নামাযের সমান। আমলের অবস্থাও তদ্রূপ। হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মদীনার মসজিদে এক নামায দশ হাজার নামাযের সমান, বায়তুল মুকাদ্দাসে এক হাজার নামাযের সমান এবং মসজিদে হারামে এক লাখ নামাযের সমান। তিনি আরও বলেন–

যে কেউ মদীনার কঠোরতা সহ্য করবে, আমি কেয়ামতের দিন তার সুপারিশকারী হব। আরও বলা হয়েছে– যে মদীনায় মরতে পারে সে যেন তাই করে। কেননা, যে মদীনায় মারা যাবে আমি তার সুপারিশকারী হব।

উপরোক্ত তিনটি স্থান ব্যতীত অন্য সকল স্থান সমান, যুদ্ধের ব্যূহ ছাড়া। শত্রুর গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্যে ব্যূহে অবস্থান করার ফযীলত অনেক। এ জন্যেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

সফর করা যাবে না; কিন্তু তিন মসজিদের দিকে– মসজিদে হারাম, আমার এই মসজিদ এবং মসজিদে আকসা। কোন কোন আলেম এই হাদীসের ভিত্তিতে পবিত্র স্থান ও কামেল ব্যক্তিবর্গের কবরে যেতে নিষেধ করেছেন। এই দলীল সঠিক বলে আমার মনে হয় না। কেননা, কবর যিয়ারতের অনুমতি রয়েছে। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন যিয়ারত কর। উপরোক্ত হাদীস মসজিদ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

মাযারসমূহের বিধান তদ্রূপ নয়। কেননা, তিনটি মসজিদ ছাড়া সকল মসজিদ একই পর্যায়ভুক্ত। এমন কোন শহর নেই, যেখানে মসজিদ নেই। তাই সফর করে অন্য মসজিদে যাওয়ার কোন মানে নেই। কিন্তু মাযার সবগুলো এক পর্যায়ভুক্ত নয়। আল্লাহ তাআলার কাছে ওলীগণের মর্তবা যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি তাঁদের মাযার যিয়ারতের বরকতও আলাদা আলাদা। তবে কেউ যদি এমন গ্রামে বাস করে যেখানে মসজিদ নেই, তার জন্যে মসজিদবিশিষ্ট গ্রামের সফর জায়েয। এর পর আমি জানি না হযরত ইবরাহীম, মূসা ও ইয়াহইয়া (আঃ) প্রমুখ পয়গম্বরের মাযারে যেতে নিষেধ করা হবে কিনা। নিষেধ করা তো একান্তই অসম্ভব। সুতরাং যখন তাঁদের মাযারে যাওয়া জায়েয বলা হবে, তখন ওলী আল্লাহগণের মাযারে যাওয়া নাজায়েয হবে কেন? এ হচ্ছে সফরের কথা। এখন অবস্থানের বিধান শুন। সফরের উদ্দেশ্য এলেম হাসিল করা না হলে মুরীদের জন্যে গৃহে অবস্থান করাই ভাল, যদি তার অবস্থা ঠিক থাকে। আর যদি অবস্থার নিরাপত্তা না থাকে, তবে এমন জায়গা তালাশ করবে, যেখানে কেউ তাকে চেনে না এবং ধর্মের নিরাপত্তা থাকে। যেখানে একনিষ্ঠভাবে এবাদত করা যায়, মুরীদের জন্যে তেমন স্থান সর্বোত্তম। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ শহর সবগুলো আল্লাহর এবং মানুষ সকলেই তাঁর বান্দা। এমতাবস্থায় যেখানে নম্রতা ও সুযোগ সুবিধা দেখবে, সেখানে অবস্থান করবে এবং আল্লাহ তাআলার শোকর করবে।

আবু নায়ীম বলেন ঃ আমি হযরত সুফিয়ান সওরীকে দেখলাম, তিনি পাথেয় সামগ্রীর থলেটি কাঁধে চাপিয়ে এবং পানির কলসটি হাতে নিয়ে কোথাও চলে যাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আবু আবদুল্লাহ! কোথায় যেতে মনস্থ করেছেন? তিনি বললেন ঃ এমন শহরে চললাম, যেখানে এক দেরহাম দিয়ে আমার এই থলেটি ভরে নিতে পারি। অন্য এক রেওয়ায়েতে তাঁর এই জওয়াব বর্ণিত আছে– আমি এক গ্রামে সুলভ মূল্যের কথা শুনেছি। সেখানে অবস্থান করব। তুমিও যখন কোন শহরে সুলভ মূল্যের কথা শুনবে, তখন সেখানে চলে যেও। এতে তোমার ধর্মও ঠিক থাকবে এবং চিন্তা-ভাবনা কম করতে হবে। তিনি বলতেন ঃ এটা অশুভ যমানা। এতে অখ্যাত ব্যক্তিও নিরাপদ থাকতে পারে না। খ্যাতদের তো কথাই নেই। এখন মানুষ ধর্মকে ফেতনার কবল থেকে বাঁচানোর জন্যে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে হিজরত করবে। তিনি আরও বলেন ঃ

আল্লাহর কসম, কোন্ শহরে যে থাকব তা বুঝে উঠতে পারি না। লোকেরা বলল ঃ খোরাসানে থাকুন। তিনি বললেন ঃ সেখানে বিভিন্ন মাযহাব এবং খারাপ মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। লোকেরা বলল ঃ সিরিয়ায় থাকুন। তিনি বললেন ঃ সেখানে সুখ্যাতি হয়ে যায়। কেউ বলল ঃ ইরাকে থাকুন। তিনি বললেন ঃ সেটা জালেমদের দেশ। বলা হল ঃ মক্কায় বসবাস করুন। তিনি বললেন ঃ মক্কা জ্ঞান ও দেহকে জীর্ণ করে দেয়। একবার জনৈক মুসাফির তাঁকে বলল ঃ আমি নিয়ত করেছি, এখন মক্কায় বসবাস করব। আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ তিনটি বিষয়ের উপদেশ দিচ্ছি- (১) প্রথম কাতারে নামায পড়ো না, (২) কোন কোরায়শীর সংসর্গ অবলম্বন করো না এবং (৩) সদকা প্রকাশ্যে দিয়ো না। প্রথম কাতারে নামায পড়তে নিষেধ করার কারণ, এতে মানুষ খ্যাত হয়ে যায়। অর্থাৎ, কোন দিন অনুপস্থিত থাকলে তাকে খোঁজ করা হয়। ফলে আসল বানোয়াট হয়ে যায়।

হজ্জের শর্তসমূহ

প্রকাশ থাকে যে, হজ্জ জায়েয হওয়ার শর্ত দুটি- সময় হওয়া ও মুসলমান হওয়া। কাজেই কোন শিশু হজ্জ করলেও তা সঠিক হবে। সে যদি ভালমন্দ বুঝার ক্ষমতা রাখে তবে নিজে এহরাম বাঁধবে। আর যদি ছোট হয় তবে তার পক্ষ থেকে ওলী এহরাম বাঁধবে এবং হজ্জের ক্রিয়াকর্ম তথা তওয়াফ, সায়ী ইত্যাদি সব করিয়ে দেবে। হজ্জের সময় শওয়াল মাস থেকে শুরু করে যিলহজ্জের দশম রাত্রি অর্থাৎ কোরবানীর দিনের সোবহে সাদেক পর্যন্ত। সুতরাং যেব্যক্তি এ সময় ছাড়া অন্য কোন সময়ে এহরাম বাঁধবে, তার হজ্জ হবে না- ওমরা হবে। ওমরার সময় সারা বছর।

হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত পাঁচটি- মুসলমান হওয়া, মুক্ত হওয়া, বালেগ হওয়া, বুদ্ধিমান হওয়া এবং সামর্থ্য থাকা। সুতরাং যদি নাবালেগ শিশু ও গোলাম এহরাম বাঁধে এবং আরাফার দিনে নাবালেগ বালেগ হয়ে যায় ও গোলাম মুক্ত হয়ে যায় কিংবা মুযদালেফায় এরূপ হয় এবং সোবহে সাদেকের পূর্বে আরাফায় চলে যায়, তবে তাদের সেই হজ্জের দ্বারাই ফরয হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। কেননা, আরাফাতে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান করাই প্রকৃতপক্ষে হজ্জ। আর এটা বালেগ ও মুক্ত অবস্থায় সম্ভব।

হজ্জের নফল হওয়ার শর্ত বালেগের জন্যে পূর্বে ফরয হজ্জ আদায় করা। কেননা, ফরয হজ্জ সর্বাগ্রে, এর পর আরাফাতে অবস্থান করে থাকলে তার কাযার স্তর, এর পর মান্নতের হজ্জ, এর পর অপরের পক্ষ থেকে হজ্জ করার স্তর এবং সর্বশেষে নফল হজ্জের স্তর। এ ক্রম জরুরী। এর খেলাফ নিয়ত করলেও হজ্জ এই ক্রমানুসারেই হবে। অর্থাৎ, কারও উপর হজ্জ ফরয থাকলে সে যদি মান্নতের নিয়তে অথবা কারও স্থলাভিষিক্ত হয়ে হজ্জের এহরাম বাঁধে, তবে তার নিয়ত ধর্তব্য হবে না এবং তার নিজের ফরয হজ্জ হয়ে যাবে।

হজ্জের ক্রিয়াকর্ম আদায় করার জন্যে সামর্থ্য এই যে, প্রথমতঃ সুস্থ হতে হবে, দ্বিতীয়তঃ পথিমধ্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য সুলভ হওয়া এবং স্থলপথে ও নৌপথে ভয়ভীতি না থাকা। তৃতীয়তঃ যাওয়া এবং দেশে ফিরে আসার জন্যে পর্যাপ্ত অর্থকড়ি থাকা। এ ছাড়া সে যাদের ভরণপোষণ করে, তাদের খরচপত্রও ফিরে আসা পর্যন্ত সময়ের জন্যে থাকা।

বিকলাঙ্গ ব্যক্তির জন্যে সামর্থ্য হচ্ছে এই পরিমাণ অর্থ থাকা, যা দ্বারা সে নিজের পক্ষ থেকে অন্য একজনকে হজ্জ করতে পাঠাবে, যে প্রথমে নিজের ফরয হজ্জ করবে, অতঃপর পরবর্তী বছর বিকলাঙ্গের পক্ষ থেকে হজ্জ করবে।

যেব্যক্তির সামর্থ্য হয়ে যায়, তার উপর হজ্জ করা ওয়াজেব; কিন্তু বিলম্বে যাওয়াও জায়েয। তবে এতে হজ্জ করতে না পারার আশংকা রয়েছে। জীবনের শেষ পর্যন্ত যদি হজ্জ করে নিতে পারে, তবে ফরয আদায় হয়ে যাবে। যদি হজ্জ ফরয হওয়ার পর হজ্জ করার পূর্বে কেউ মারা যায়, তবে সে গোনাহগার হয়ে আল্লাহর সামনে যাবে। সে ওসিয়ত করে না থাকলেও তার ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে হজ্জ করাতে হবে। ঋণের অবস্থাও তদ্রূপ। ওসিয়ত ছাড়াই তা শোধ করতে হয়। যদি এক বছর কারও সামর্থ্য হয়, কিন্তু সে হজ্জে গেল না, অতঃপর হজ্জ অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই তার ধনসম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেল এবং সে-ও মারা গেল, তবে তাকে হজ্জের জন্যে পাকড়াও করা হবে না। পক্ষান্তরে যেব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করে মারা যায়, সে গুরুতর পরিণতির সম্মুখীন হবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি শহরে শহরে এই পরওয়ানা পাঠাতে চাই যে, হজ্জের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে হজ্জ করে না,

তার উপর জিযিয়া কর আরোপ করা হবে। সায়ীদ ইবনে জুবায়র, ইবরাহীম নখয়ী, মুজাহিদ ও তাউস (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা বলেন ঃ আমরা যদি জানি, এক ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয ছিল; কিন্তু হজ্জ করার পূর্বেই সে মারা গেছে, তবে আমরা তার জানাযার নামায পড়ব না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতেন ঃ যেব্যক্তি যাকাত না দিয়ে এবং হজ্জ না করে মারা যায়, সে পৃথিবীতে ফিরে আসার আবেদন করে। অতঃপর এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন–

رَبِّ ارْجِعُوْنِ لَعَلِّىْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ ـ

অর্থাৎ, পরওয়ারদেগার, আমাকে দুনিয়াতে ফিরিয়ে দিন, যাতে আমি সৎকর্ম সম্পাদন করতে পারি যা আমি পরিত্যাগ করেছি।

এখানে সৎকর্ম বলে হজ্জ বুঝানো হয়েছে। হজ্জের আরকান পাঁচটি। এগুলো ব্যতীত হজ্জ সঠিক হয় না– এহরাম বাঁধা, তওয়াফ করা, তওয়াফের পরে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে দৌড়াদৌড়ি করা, আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা এবং এক উক্তি অনুযায়ী কেশ মুন্ডন করা। ওমরার আরকানও তাই। তবে ওমরার মধ্যে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করতে হয় না। হজ্জের কতকগুলো ওয়াজেব কর্ম আছে। সেগুলো ছেড়ে দিলে কোরবানীর জন্তু যবেহ করে তার ক্ষতিপূরণ করতে হয়। এরকম ওয়াজেব কর্ম ছয়টি ঃ (১) মীকাত (এহরামের নির্দিষ্ট স্থান) থেকে এহরাম বাঁধা। কেউ এহরাম না বেঁধেই মীকাত অতিক্রম করে গেলে একটি ছাগল যবেহ করা তার উপর অপরিহার্য হয়ে যাবে। (২) কংকর নিক্ষেপ করা। এটা ছেড়ে দিলে সকল রেওয়ায়েত অনুযায়ী কোরবানী করা জরুরী। (৩) আরাফাতের ময়দানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করা। (৪) রাত্রে মুযদালেফায় যাওয়া, (৫) রাত্রে মিনায় অবস্থান করা এবং (৬) বিদায়ী তওয়াফ করা। এ চারটি ছেড়ে দিলে এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী কোরবানী জরুরী এবং এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী জরুরী নয়; বরং মোস্তাহাব।

প্রকাশ থাকে যে, হজ্জ ও ওমরা তিন প্রকারে আদায় করা যায়– (১) এফরাদ। এটা সর্বোত্তম। এর নিয়ম, প্রথমে শুধু হজ্জ করবে। হজ্জ শেষে হরমের বাইরে গিয়ে এহরাম বাঁধবে এবং ওমরা করবে। ওমরার এহরামের জন্যে হরমের বাইরে সর্বোত্তম স্থান জেয়েররানা, এর পর তানয়ীম, এর পর হুদায়বিয়া। যারা এফরাদ করে, তাদের উপর কোন

কোরবানী ওয়াজেব নয়। নফল কোরবানী করতে পারে।

(২) কেরান, অর্থাৎ এহরামে হজ্জ ও ওমরা উভয়টির নিয়ত করবে এবং বলবে ঃ لبيك حجة وعمرة معا (আমি হজ্জ ও ওমরা একসাথে করার জন্যে উপস্থিত)। এরূপ ব্যক্তির জন্যে হজ্জের ক্রিয়াকর্ম করাই যথেষ্ট। এতেই ওমরাও আদায় হয়ে যায়। যেমন গোসল দ্বারা ওযু আদায় হয়ে যায়। কিন্তু যদি তওয়াফ ও সাফা মারওয়ার দৌড় আরাফাতে অবস্থান করার পূর্বে করে নেয়, তবে দৌড় তো উভয়টির পক্ষ থেকে গণ্য হবে; কিন্তু তওয়াফ হজ্জে গণ্য করা হবে না। কেননা, হজ্জে তওয়াফের জন্যে শর্ত হচ্ছে আরাফাতে অবস্থানের পরে করা। যে কেরান করে, তার উপর একটি ছাগল যবেহ করা ওয়াজেব। তবে মক্কার অধিবাসী হলে ওয়াজেব নয়। কেননা, সে মীকাত ছেড়ে দেয়নি। তার মীকাত মক্কা।

(৩) তামাত্তোর নিয়ম– মীকাত থেকে ওমরার এহরাম বাঁধবে। অতঃপর হজ্জের এহরাম বাঁধবে। পাঁচটি বিষয় ছাড়া তামাত্তো হয় না– (১) যে তামাত্তো করবে, তার বাসস্থান ও মসজিদে হারামের মধ্যে শরীয়তসম্মত সফরের দূরত্ব না থাকা, (২) হজ্জের পূর্বে ওমরা করা, (৩) হজ্জের মাসসমূহেই ওমরা করা, (৪) হজ্জের মীকাত পর্যন্ত ফিরে না যাওয়া এবং (৫) তার হজ্জ ও ওমরা এক ব্যক্তির পক্ষ থেকেই হওয়া। তামাত্তোকারীর উপর একটি ছাগল কোরবানী করা ওয়াজেব। ছাগল পাওয়া না গেলে ১০ই যিলহজ্জের পূর্ব পর্যন্ত তিনটি রোযা রাখবে এবং দেশে ফিরে সাতটি রোযা রাখবে। হজ্জের দিনে তিন রোযা না রাখলে দেশে ফিরে নিরন্তর অথবা ফাঁক দিয়ে দশটি রোযা রাখবে। কেরানে ছাগল না পাওয়া গেলেও এভাবে রোযা রাখবে। এই তিন প্রকারের মধ্যে সর্বোত্তম প্রকার হচ্ছে এফরাদ, এর পর তামাত্তো, এর পর কেরান।

হজ্জ ও ওমরায় ছয়টি বিষয় নিষিদ্ধ– (১) কোর্তা, পায়জামা, মোজা ও পাগড়ী পরিধান করা। এমতাবস্থায় লুঙ্গি, চাদর ও সেন্ডেল পরিধান করা উচিত। সেন্ডেল না হলে জুতা পরিধান করবে। লুঙ্গি না হলে পায়জামা পরবে। মাথা আবৃত করা উচিত নয়। কারণ, পুরুষের এহরাম মাথায়। মহিলা সেলাই করা বস্ত্র পরিধান করতে পারে যদি মুখ এমন বস্তু দ্বারা আবৃত না করে, যা মুখমন্ডলে লাগে। কেননা, মহিলার এহরাম মুখমন্ডলে।

(২) সুগন্ধি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। সুগন্ধি লাগালে এবং কাল পোশাক পরিধান করলে একটি ছাগল কোরবানী করা জরুরী হবে।

(৩) চুল মুন্ডন করা ও কাটা নিষিদ্ধ। এটা করলেও ছাগল কোরবানী করা জরুরী। সুরমা লাগানো এবং চুলে চিরুনি করায় কোন দোষ নেই।

(৪) স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ। এটা যবেহ ও মাথা মুন্ডনের পূর্বে করলে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে এবং উট, গরু অথবা সাতটি ছাগল যবেহ করা অপরিহার্য হয়ে যাবে। আর যদি যবেহ ও মাথা মুন্ডনের পরে করে, তবে কোরবানী ওয়াজেব হবে; কিন্তু হজ্জ বাতিল হবে না।

(৫) স্ত্রীর সাথে এমনভাবে চুম্বন, কোলাকুলি করা এবং তাকে স্পর্শ করা নিষিদ্ধ, যাতে মযি বের হয়ে পড়ে। এতে এক ছাগল কোরবানী করা জরুরী।

(৬) জঙ্গলের শিকার বধ করা নিষিদ্ধ, যার গোশত খাওয়া যায়। এহরাম অবস্থায় শিকার বধ করলে তার উপর এই শিকারের মতই চতুষ্পদ জন্তু দেয়া ওয়াজেব হবে। নদীর শিকার হালাল। এতে কোন দম নেই।

সফর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত বাহ্যিক কর্মসমূহ

গৃহ থেকে বের হওয়ার সময় থেকে এহরাম বাঁধা পর্যন্ত আটটি বিষয় সুন্নত ঃ

(১) সফরের ইচ্ছা করার সময় প্রথমে তওবা করবে। যাদের হক বলপূর্বক আত্মসাত করে থাকবে, তাদেরকে তা ফেরত দেবে। ঋণ থাকলে তা শোধ করবে। যাদের ভরণ-পোষণ তার যিম্মায়, ফিরে আসা পর্যন্ত তা তাদেরকে দেবে। কারও আমানত থাকলে তা তাকে সমর্পণ করবে। যাতায়াতের খরচের জন্যে পর্যাপ্ত হালাল ও পবিত্র টাকা-পয়সা সাথে নেবে, যাতে সংকটে পড়তে না হয় এবং সামর্থ্যানুযায়ী ফকীর-মিসকীনের প্রতিও দয়া দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করতে পারে। রওয়ানা হওয়ার পূর্বে কিছু খয়রাত করবে। এটা অর্থ সম্পর্কিত সুন্নত।

(২) একজন সৎ, হিতাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধুভাবাপন্ন সফরসঙ্গী তালাশ করবে, যাতে সে পথের বিপদাপদে বল ভরসা দিতে পারে। অতঃপর বন্ধুবান্ধব, ভাই-বেরাদর ও প্রতিবেশীদের কাছ থেকে যথারীতি বিদায় নেবে এবং তাদের কাছে দোয়া প্রার্থনা করবে। বিদায়ের সময় এই দোয়া পড়বে– أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمُ عَمَلِكَ আমি তোমার ধর্ম, তোমার আমানত ও তোমার কর্মের পরিণতি আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি। অর্থাৎ তোমার পরিণতি শুভ হোক। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মুসাফিরের জন্যে এই দোয়া করতেন ঃ

فِىْ حِفْظِ اللّٰهِ وَكُنْفِهِ وَزَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰى وَجَنْبَكَ الرَّدِيِّ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَوَجْهَكَ لِلْخَيْرِ اَيْنَمَا تَوَجَّهْتَ ـ

অর্থাৎ আল্লাহর হেফাযতে ও আশ্রয়ে সমর্পণ করি। আল্লাহ্ তোমাকে তাকওয়ার পাথেয় দিন, তোমাকে ধ্বংস থেকে বাঁচিয়ে রাখুন, তোমার গোনাহ্ ক্ষমা করুন এবং যেদিকে তুমি যাও সেদিকেই তোমাকে মঙ্গলের সম্মুখীন করুন। এটা সফরসঙ্গী সম্পর্কিত সুন্নত।

(৩) গৃহ থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করার সময় প্রথমে দু'রাকআত নামায পড়বে। প্রথম রাকআতে আলহামদুর পরে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা এখলাস পড়বে। সালামের পর হাত তুলে পূর্ণ আন্তরিকতা ও সততা সহকারে দোয়া করবে– ইলাহী, তুমিই সফরে আমাদের সঙ্গী। তুমিই আমাদের গৃহ, ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে নায়েব ও রক্ষক। আমাদেরকে ও তাদেরকে সকল বিপদাপদ থেকে রক্ষা করো। ইলাহী, এ সফরে আমরা তোমার কাছে পরহেযগারী প্রার্থনা করি। আমরা যেন এমন কর্ম করি, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। ইলাহী, তোমার কাছে প্রার্থনা করি, তুমি আমাদেরকে সফরের দূরত্ব অতিক্রম করিয়ে দাও, সফর আমাদের জন্যে সহজ কর। সফরে আমাদের দেহের, ধন-সম্পদের ও ধর্মের নিরাপত্তা দান কর এবং তোমার গৃহের, তোমার নবী (সাঃ)-এর কবরের যিয়ারত পর্যন্ত আমাদের পৌঁছাও। ইলাহী, আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই সফরের কষ্ট থেকে, দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে ফিরে আসা থেকে এবং পরিবারের লোকজন, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে দুর্দশাগ্রস্ত দেখা থেকে। ইলাহী, আমাদেরকে ও তাদেরকে আপন হেফাযতে গ্রহণ কর, আমাদের থেকে ও তাদের থেকে আপন নেয়ামত ছিনিয়ে নিও না এবং আমাদেরকে ও তাদেরকে যে আরাম দিয়ে রেখেছ, তা পরিবর্তন করো না। এটা গৃহ থেকে বের হওয়া সম্পর্কিত সুন্নত।

(৪) গৃহের দরজায় পৌঁছে এই দোয়া করবে–

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْيُضَلَّ اَوْ اَذِلَّ اَوْيُذَلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ يُزَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ يُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ ۔

আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর উপর ভরসা করছি। গোনাহ থেকে বাঁচার এবং এবাদত করার শক্তি নেই আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত। পরওয়ারদেগার, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে অথবা আমাকে পথভ্রষ্ট করা থেকে অথবা আমার লাঞ্ছিত হওয়া থেকে অথবা আমাকে পদস্খলিত করা থেকে অথবা আমার জুলুম করা থেকে অথবা আমার প্রতি জুলুম করা থেকে। আরও বলবে– ইলাহী, আমি অহংকারবশে, আস্ফালনবশে ও সুখ্যাতির জন্যে বের হইনি; বরং তোমার ক্রোধের ভয়ে, তোমার সন্তুষ্টির জন্যে তোমার ফরয আদায় করার জন্যে, তোমার নবীর সুন্নত পালন করার জন্যে এবং তোমার দীদারের আগ্রহে বের হয়েছি।

পথ চলার সময় নিম্নরূপ দোয়া পড়বে–

হে আল্লাহ, তোমার সাহায্যে আমি চলেছি, তোমার উপর ভরসা করেছি, তোমাকেই আঁকড়ে ধরেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি। হে আল্লাহ! তুমিই আমার ভরসা, তুমিই আমার আশা। অতএব আমাকে বাঁচাও সেই বিষয় থেকে, যা আমার সামনে আসে, যার ব্যবস্থা আমি করতে পারি না এবং যা তুমি আমার চেয়ে বেশী জান। তোমার প্রশংসা মহান। তুমি ছাড়া মাবুদ নেই। হে আল্লাহ, আমাকে তাকওয়ার পাথেয় দাও, আমার গোনাহ্ মাফ কর এবং আমি যেখানেই যাই মঙ্গলকে আমার সাথী কর।

(৫) যানবাহনে সওয়ার হওয়ার সময় নিম্নরূপ দোয়া পাঠ করা সুন্নত–

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ

وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِيْ كُلَّهٗ اِلَيْكَ وَتَوَكَّلْتُ فِيْ جَمِيْعِ اُمُوْرِيْ عَلَيْكَ اَنْتَ حَسْبِيْ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ۔

আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র নামে শুরু করছি। আল্লাহ মহান। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি। কোন শক্তি ও ক্ষমতা নেই; কিন্তু সুউচ্চ ও মহান আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া। আল্লাহ যা চেয়েছেন তা হয়েছে এবং তিনি যা চাননি তা হয়নি। পবিত্র তিনি, যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। আমরা তা বশ করতে পারতাম না। নিশ্চয় আমরা আমাদের পালনকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমি তোমার দিকে মুখ করেছি, আমার সকল বিষয় তোমাকে সমর্পণ করেছি এবং সকল বিষয়ে তোমার উপর ভরসা করেছি। তুমি আমার জন্যে যথেষ্ট ও চমৎকার কার্যনির্বাহী।

সওয়ারীর উপর সুস্থিরে বসা ও সওয়ারী নিয়ন্ত্রণে আসার পর সাত বার বলবে–

سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ۔

আল্লাহ্ পবিত্র। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আল্লাহ্ মহান। আরও বলবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْحَامِلُ عَلَى الظَّهْرِ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ عَلَى الْاُمُوْرِ ۔

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদেরকে এ পথ প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ পথ পদর্শন না করলে আমরা পথ পেতাম না। হে আল্লাহ, তুমিই সওয়ারীর পিঠে বহন করিয়েছ। সকল বিষয়ে তোমার কাছেই সাহায্য চাওয়া হয়।

(৬) সওয়ারী থেকে অবতরণের ক্ষেত্রে সুন্নত এই যে, রৌদ্র প্রখর না হওয়া পর্যন্ত অবতরণ করবে না। রাতের বেলায় অনেক পথ অতিক্রম করে নেবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ শেষ রাতে চল। রাতে এত পথ চলা যায়, যা দিনে যায় না। রাতে কম ঘুমানো উচিত, যাতে রাতের বেলায় পথ চলতে সহায়ক হয়। মনযিল দৃষ্টিগোচর হলে বলবে–

হে আল্লাহ্! পালনকর্তা সপ্ত আকাশের এবং সেসব বস্তুর, যাদের উপর সপ্ত আকাশ ছায়াপাত করে এবং পালনকর্তা সপ্ত পৃথিবীর এবং সেসব বস্তুর, যাদেরকে শয়তানরা পথভ্রষ্ট করেছে এবং পালনকর্তা শয়তানের এবং তাদের যাদেরকে বাতাস উড়িয়ে নেয় এবং পালনকর্তা সমুদ্রের এবং সেসব বস্তুর, যাদেরকে সমুদ্র বয়ে নিয়ে যায়– আমি তোমার কাছেএই মনযিলের কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং এর অধিবাসীদের কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আমি তোমার কাছে এই মনযিলের অকল্যাণ থেকে এবং এতে যা আছে তার অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাই। তাদের দুষ্টদের অনিষ্ট আমা থেকে হটিয়ে দাও। মনযিলে অবতরণ করে দু'রাকআত নামায পড়বে। এর পর বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِىْ
لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ -

হে আল্লাহ্! আমি আল্লাহর পূর্ণ কলেমা দ্বারা– যেগুলোকে কোন সৎ ও অসৎ অতিক্রম করতে পারে না– সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই। যখন রাতের অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে, তখন বলবে ঃ

হে পৃথিবী! আমার ও তোমার রব আল্লাহ। আমি আল্লাহর কাছে তোমার ও তোমার মধ্যস্থিত সবকিছু থেকে আশ্রয় চাই এবং তোমার উপর যা বিচরণ করে, তা থেকে। আমি আশ্রয় চাই আল্লাহর কাছে প্রত্যেক সিংহ, অজগর, সাপ ও বিচ্ছুর অনিষ্ট থেকে এবং শহরবাসী, পিতা ও সন্তান এবং যারা রাতে ও দিনে বসবাস করে, তার অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

(৭) পথ চলার সময় সাবধানে চলবে এবং দিনের বেলায় কাফেলা থেকে আলাদা হয়ে চলবে না। কারণ, এতে কোন তস্করের হাতে মারা যাওয়া অথবা পথ ভুলে কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া বিচিত্র নয়।

রাত্রে নিদ্রার সময় হুশিয়ার থাকবে। রাতের শুরুতে নিদ্রা গেলে হাত প্রসারিত করবে না। শেষ রাতে নিদ্রা গেলে হাত কিছু উঠিয়ে রাখবে এবং হাতের তালুতে মাথা রেখে নিদ্রা যাবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সফরে এমনিভাবে নিদ্রা যেতেন। কেননা, অন্যভাবে নিদ্রা গেলে নিদ্রা গভীর হয়ে যেতে পারে। রাতের বেলায় দু'জন সঙ্গী পালাক্রমে জাগ্রত থেকে একে অপরের পাহারা দেয়া মোস্তাহাব। রাতে অথবা দিনে শত্রু কিংবা হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে আয়াতুল কুরসী, شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ সূরা এখলাস এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে নেবে। সর্বশেষে এই দোয়া পাঠ করবে–

بِسْمِ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ حَسْبِىَ اللّٰهُ
تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا يَاتِى بِالْخَيْرَاتِ اِلَّا
اللّٰهُ مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا يَصْرِفُ السُّوْءَ اِلَّا اللّٰهُ حَسْبِىَ وَكَفٰى
سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ دَعَا لَيْسَ وَرَاءَ اللّٰهِ مُنْتَهٰى وَلَا دُوْنَ اللّٰهِ
مَلْجَاً كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ
تَحَصَّنْتُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَاسْتَعَنْتُ بِالْحَىِّ الَّذِىْ لَا
يَمُوْتُ اَللّٰهُمَّ احْرُسْنَا بِعَيْنِكَ الَّتِىْ لَا تَنَامُ وَاكْنُفْنَا
بِرُكْنِكَ الَّذِىْ لَا يُرَامُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنَا بِقُدْرَتِكَ عَلَيْنَا
فَلَا تَهْلِكُ وَاَنْتَ ثِقَتُنَا وَرَجَاءُنَا اَللّٰهُمَّ اعْطِفْ عَلَيْنَا
قُلُوْبَ عِبَادِكَ وَاِمَائِكَ بِرَافَةٍ وَرَحْمَةٍ اِنَّكَ اَنْتَ اَرْحَمُ
الرَّاحِمِيْنَ -

(প্রথমাংশের অর্থ পূর্বের দোয়াসমূহে বর্ণিত হয়েছে।) মঙ্গল আনয়ন করে না; কিন্তু আল্লাহ। আল্লাহই অনিষ্ট বিদূরিত করেন। আল্লাহ আমার জন্যে যথেষ্ট। যে দোয়া করে আল্লাহ্ তার কথা শুনেন। আল্লাহর পশ্চাতে

কোন শেষ সীমা নেই। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন আশ্রয় নেই। আল্লাহ্ বলেছেন, আমি ও আমার রসূলগণ জয়ী হবো। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রান্ত। আমি মহান আল্লাহর সাহায্যকে দুর্গ করেছি এবং সাহায্য চেয়েছি চিরঞ্জীবের কাছে, যিনি মারবেন না। ইলাহী, আপন চোখে আমাদের হেফাযত কর, যে নিদ্রিত হয় না এবং আমাদেরকে আশ্রয় দাও আপন ইযযত দ্বারা, যা তলব করা হয় না। ইলাহী, আপন কুদরত দ্বারা আমাদের প্রতি রহম কর, যাতে আমরা ধ্বংস না হই, যখন তুমি আমাদের ভরসা ও আশা। ইলাহী, আমাদের প্রতি তোমার দাস দাসীদের অন্তরকে কৃপাশীল করে দাও, তুমি শ্রেষ্ঠতম রহমকারী।

(৮) পথিমধ্যে কোন উঁচু জায়গায় আরোহণ করলে তিন বার আল্লাহু আকবার বলে এই দোয়া পড়া মোস্তাহাব–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الشَّرْفُ عَلٰى كُلِّ شَرْفٍ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلٰى كُلِّ حَالٍ۔

হে আল্লাহ! সকল গৌরবের উপরে তোমার গৌরব এবং তোমার প্রশংসা সর্বাবস্থায়। নিম্নভূমিতে অবতরণ করার সময় 'সোবহানাল্লাহ' বলবে। সফরে মনে আতঙ্ক দেখা দিলে এই দোয়া পড়বে–

سُبْحٰنَ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ جَلَلَتِ السَّمٰوَاتُ بِالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ۔

যিনি বিশ্ব জাহানের মহান অধিপতি, ফেরেশতাগণ ও জিব্রাঈলের পরওয়ারদেগার, যার ইযযত ও প্রতাপে আকাশমণ্ডলী আচ্ছন্ন হয়ে আছে, সে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

মীকাত থেকে মক্কায় প্রবেশ পর্যন্ত

এহরামের আদব

মীকাত অর্থাৎ এহরাম বাঁধার স্থান থেকে মক্কায় প্রবেশ পর্যন্ত আদব পাঁচটি ঃ

(১) যে প্রসিদ্ধ স্থানে হাজীরা এহরাম বাঁধে, সেখানে পৌছার পর

এহরামের নিয়তে গোসল করবে, দেহকে খুব পরিষ্কার করবে, মাথায় ও দাড়িতে চিরুনি করবে, নখ কাটবে এবং গোঁফ ছাঁটবে।

(২) সেলাই করা পোশাক খুলে ফেলবে। অতঃপর এহরামের পোশাক তথা একটি সাদা লুঙ্গি ও একটি সাদা চাদর পরিধান করবে। সাদা পোশক আল্লাহ্ তাআলার কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় ও প্রিয়। পোশাক ও শরীরে সুগন্ধি লাগাবে। এহরামের পরেও সুগন্ধির অংশবিশেষ থেকে গেলে কোন ক্ষতি নেই। কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সিঁথিতে মেশকের চিহ্ন এহরামের পরেও লোকেরা দেখেছে, যা তিনি এহরামের পূর্বে লাগিয়েছিলেন।

(৩) এহ্রাম পরিধান করার পর যখন চলা শুরু করবে, তখন হজ্জ, ওমরা, কেরান অথবা এফরাদের নিয়ত করবে। এহ্রাম সহীহ হওয়ার জন্যে মনে মনে ইচ্ছা করাই যথেষ্ট। তবে 'লাব্বায়কার' এই দোয়া পাঠ করা সুন্নত–

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ۔

আমি হাযির হে আল্লাহ! আমি হাযির। তোমার কোন শরীক নেই। আমি হাযির। প্রশংসা ও নেয়ামত তোমার। সাম্রাজ্য তোমার, তোমার কোন শরীক নেই। আরও বেশী বলতে চাইলে এরূপ বলবে–

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرَ كُلَّهُ بِيَدِكَ وَالرَّغْبَاءُ اِلَيْكَ لَبَّيْكَ لِحَجَّةٍ حَقًّا وَتَعَبُّدًا وَرِقًّا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ۔

আমি হাযির। আমি তৎপর। যাবতীয় কল্যাণই তোমার হাতে। আগ্রহ তোমার প্রতি। আমি হাযির হজ্জের জন্যে। প্রকৃত বন্দেগী ও গোলামীর জন্যে। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের বংশধরের প্রতি রহমত করুন।

(৪) লাব্বায়েক বলার মাধ্যমে এহরাম হয়ে যাওয়ার পর নিম্নোক্ত দোয়া বলা মোস্তাহাব–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَاَعِنِّىْ عَلٰى اَدَاءِ فَرْضِهٖ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ نَوَيْتُ اَدَاءَ فَرِيْضَتِكَ فِى الْحَجِّ فَاجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لَكَ وَاٰمَنُوْا بِوَعْدِكَ وَاتَّبَعُوْا اَمْرَكَ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ وَفْدِكَ الَّذِيْنَ رَضِيْتَ عَنْهُمْ وَارْتَضَيْتَ وَقَبِلْتَ مِنْهُمْ اَللّٰهُمَّ فَيَسِّرْلِىْ اَدَاءَ مَا نَوَيْتُ مِنَ الْحَجِّ اَللّٰهُمَّ قَدْ اَحْرَمَ لَكَ لَحْمِىْ وَشَعْرِىْ وَدَمِىْ وَعَصَبِىْ وَمُخِّىْ وَعِظَامِىْ وَحَرَّمْتُ عَلٰى نَفْسِى النِّسَاءَ وَالطِّيْبَ وَلُبْسَ الْمُخِيْطِ اِبْتِغَاءَ وَجْهِكَ وَالدَّارِ الْاٰخِرَةِ۔

হে আল্লাহ! আমি হজ্জ করতে চাই। অতএব একে আমার জন্য সহজ কর। এর ফরয আদায়ে আমাকে সাহায্য কর এবং আমার পক্ষ থেকে কবুল কর। ইলাহী, আমি হজ্জে তোমার ফরয আদায় করার নিয়ত করেছি। অতএব তুমি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর, যারা তোমার আদেশে সাড়া দিয়েছে, তোমার প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করেছে এবং তোমার আদেশ অনুসরণ করেছে। আমাকে তোমার সেই প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত কর, যাদের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট ও আনন্দিত এবং যাদের হজ্জ তুমি কবুল করেছ। ইলাহী, যে হজ্জের নিয়ত করেছি তা আদায় করা আমার জন্য সহজ কর। ইলাহী, তোমার জন্য আমার মাংস, আমার চুল, আমার রক্ত, শিরা-উপশিরা, অস্থিমজ্জা এহরাম বেঁধেছে। আর আমি নিজের উপর নারী, সুগন্ধি ও সেলাই করা কাপড় কেবল তোমার সন্তুষ্টি ও আখেরাতের উদ্দেশে হারাম করে দিয়েছি। এহরামের সময় থেকে পূর্ববর্ণিত ছয়টি নিষিদ্ধ বিষয় হারাম হয়ে যায়।

(৫) এহরাম অব্যাহত থাকার জন্যে ক্ষণে ক্ষণে লাব্বায়কা বলা মোস্তাহাব; বিশেষত সঙ্গী-সাথীদের সাথে সাক্ষাতের সময়, সমাবেশের সময়, উচ্চভূমিতে উঠার সময়, নিম্নভূমিতে অবতরণের সময় এবং সওয়ারীতে উঠানামা করার সময় সরবে লাব্বায়কা বলা উচিত। চীৎকার করে এবং শ্বাসরুদ্ধ করে বলতে হবে না। কেননা, উদ্দেশ্য আল্লাহকে

শুনানো। তিনি বধির ও অনুপস্থিত নন যে, চীৎকার করতে হবে। হাদীসেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। মসজিদে হারাম, মসজিদে খায়ফ ও মসজিদে মীকাতে উচ্চ স্বরে লাব্বায়কা বললে ক্ষতি নেই। এ তিনটি মসজিদই হজ্জের আরকান আদায় করার জায়গা। কিন্তু এছাড়া অন্যান্য মসজিদে নীরবে লাব্বায়কা বললে কোন দোষ হবে না।

মক্কায় প্রবেশ করার আদব

মক্কায় প্রবেশ করার পর তওয়াফ পর্যন্ত আদব ছয়টি ঃ

মক্কায় প্রবেশের জন্যে যী-তুয়ায় গোসল করবে। হজ্জে সুন্নত গোসল নয়টি– (১) এহরামের জন্যে মীকাতে, (২) মক্কায় যাওয়ার জন্যে, (৩) তওয়াফের জন্যে, (৪) আরাফাতে অবস্থানের জন্যে, (৫) মুযদালেফায় অবস্থানের জন্যে (৬) তওয়াফে যিয়ারতের জন্যে, (৭-৮) দু'গোসল দু'জামরার কংকর নিক্ষেপের জন্যে– জামরা আকাবার কংকর নিক্ষেপের জন্য গোসল নেই, (৯) বিদায়ী তওয়াফের জন্যে।

(২) মক্কার বাইরে যখন হরমের সীমায় প্রবেশ করবে তখন বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ هٰذَا حَرَمُكَ وَاَمْنُكَ فَحَرِّمْ لَحْمِىْ وَدَمِىْ وَبَشَرِىْ عَلَى النَّارِ وَاٰمِنِّىْ مِنْ عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ اَوْلِيَائِكَ وَاَهْلِ طَاعَتِكَ ـ

হে আল্লাহ! এটা তোমার হরম ও আশ্রয়স্থল। অতএব আমার মাংস, রক্ত ও ত্বককে জাহান্নামের জন্যে হারাম কর, পুনরুত্থানের দিন আমাকে আযাব থেকে নিরাপদ রাখ এবং আমাকে তোমার ওলী ও আনুগত্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর।

(৩) মক্কায় কুদা গিরিপথ দিয়ে পানির স্রোতের দিকে যাবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মধ্যবর্তী পথ ছেড়ে এ পথই অবলম্বন করেছিলেন। তাই এ ব্যাপারে তাঁর অনুসরণ করা ভাল। মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় কুদা গিরিপথ দিয়ে রেব হবে। এটা কিছু নীচু ও প্রশস্ত।

(৪) মক্কায় প্রবেশের সময় বনী জুমাহে পৌঁছালে কাবা গৃহের উপর দৃষ্টি পড়বে। তখন এই দোয়া বলা উচিত–

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَدَارُكَ دَارُ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ يَا ذِي الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا بَيْتُكَ عَظَّمْتَهٗ وَكَرَّمْتَهٗ وَشَرَّفْتَهٗ اَللّٰهُمَّ فَزِدْهُ تَعْظِيْمًا وَزِدْهُ تَشْرِيْفًا وَتَكْرِيْمًا وَزِدْهُ مَهَابَةً وَزِدْهُ مَنْ حَجَّهٗ بِرًّا وَكَرَامَةً اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَادْخِلْنِيْ جَنَّتَكَ وَاَعِذْنِيْ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۔

আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আল্লাহ মহান। হে আল্লাহ! তুমি শান্তি, তোমা থেকে শান্তি। তোমার গৃহ শান্তির গৃহ। তুমি বরকতওয়ালা, হে প্রতাপশালী, সম্মানিত, হে আল্লাহ! এটা তোমার গৃহ, যাকে তুমি মহত্ত্ব দিয়েছ, সম্মান দিয়েছ ও গৌরবান্বিত করেছ। হে আল্লাহ! বৃদ্ধি কর তার মাহাত্ম্য, গৌরব ও সম্মান। আরও বৃদ্ধি কর তার ভয়ভীতি। যে এ গৃহের হজ্জ করে তার সততা ও সম্মান বৃদ্ধি কর। হে আল্লাহ! তোমার রহমতের দরজা আমার জন্যে খুলে দাও, আমাকে তোমার জান্নাতে দাখিল কর এবং আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় দাও।

(৫) মসজিদে হারামে প্রবেশ করার সময় বনী শায়বার দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বলবে–

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَمِنَ اللّٰهِ وَاِلَى اللّٰهِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۔

আল্লাহর নামে শুরু, আল্লাহর সাহায্যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে, আল্লাহর দিকে এবং আল্লাহর পথে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী। কা'বা গৃহের নিকটবর্তী হলে বলবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَعَلٰى اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِكَ وَعَلٰى جَمِيْعِ اَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ ۔

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। সালাম তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি। হে আল্লাহ! রহমত প্রেরণ কর মুহাম্মদের প্রতি, যিনি তোমার বান্দা, তোমার রসূল, ইব্রাহীমের প্রতি, যিনি তোমার খলীল এবং সকল নবী ও রসূলের প্রতি। অতঃপর হাত তুলে নিম্নরূপ দোয়া করবে–

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এই স্থানে আমার হজ্জের প্রথম কর্মে প্রার্থনা করছি, আমার তওবা কবুল কর, আমার ত্রুটি মার্জনা কর এবং আমার উপর থেকে গোনাহের বোঝা নামিয়ে দাও। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে তাঁর পবিত্র গৃহে পৌঁছিয়েছেন, যে গৃহকে তিনি মানুষের জন্যে করেছেন প্রত্যাবর্তনের স্থল ও আশ্রয়। একে আরও করেছেন বরকতময় ও বিশ্বজগতের জন্যে হেদায়াত। হে আল্লাহ! আমি তোমার গোলাম, এ শহর তোমার শহর, এ হরম তোমার হরম, এ গৃহ তোমার গৃহ। আমি তোমার রহমত তলব করতে এসেছি। আমি অক্ষমের মত, তোমার শাস্তির ভয়ে ভীত ব্যক্তির মত, তোমার রহমত প্রার্থীর মত, তোমার সন্তুষ্টি কামনাকারীর মত তোমার কাছে প্রার্থনা করছি।

(৬) এর পর কাল পাথরের কাছে গিয়ে ডান হাতে তা স্পর্শ করবে এবং চুম্বন করে বলবে– হে আল্লাহ্! আমি আমার আমানত প্রত্যর্পণ করলাম এবং আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করলাম। তুমি এই পূর্ণতায় সাক্ষী থাক। চুম্বন সম্ভবপর না হলে পাথরের সামনে দাঁড়িয়ে এ দোয়া পড়ে নেবে। এর পর তওয়াফ ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি মনোযোগ দেবে না। এ তওয়াফকে 'তওয়াফে কুদুম' বলা হয়। তখন অন্যান্য লোক ফরয নামাযে নিয়োজিত থাকলে নিজেও ফরয নামাযে শরীক হয়ে যাবে এবং পরে তওয়াফ করবে।

তওয়াফের আদব

তওয়াফে কুদুম অথবা অন্য কোন তওয়াফ শুরু করলে ছয়টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে ঃ

(১) নামাযের শর্তসমূহ পূর্ণ করতে হবে অর্থাৎ, অযু করতে হবে, কাপড়-চোপড়, শরীর ও তওয়াফের জায়গা পাক হতে হবে এবং নগ্নতা দূর করতে হবে। কেননা, কা'বা গৃহের তওয়াফও নামাযের সমতুল্য।

এতে অবশ্য পারস্পরিক কথা বলার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তওয়াফের পূর্বে এস্তেবাগ করে নেয়া উচিত। অর্থাৎ, চাদরের প্যাঁচ ডান বগলের নীচ দিয়ে বের করে উভয় প্রান্ত বাম কাঁধের উপর রেখে দেবে। এমতাবস্থায় চাদরের এক প্রান্ত পিঠে ঝুলবে এবং অপর প্রান্ত বুকের উপর। তওয়াফের শুরু থেকে 'লাব্বায়কা' বলা বন্ধ করবে। তওয়াফের দোয়াসমূহ পরবর্তীতে উল্লেখ করা হবে।

(২) এস্তেবাগ সমাপ্ত হলে কা'বা গৃহকে বাম দিকে রাখবে এবং কাল পাথরের সামান্য দূরে দাঁড়াবে, যাতে তওয়াফের শুরুতে সমস্ত দেহ কাল পাথরের বিপরীত দিকে চলে যায়। নিজের মধ্যে এবং কাবা ঘরের মধ্যে তিন কদম দূরত্ব রাখা উচিত, যাতে কাবা গৃহের কাছেও থাকে এবং শাযরাওয়ানের উপর তওয়াফও না হয়। এটা কাবার অন্তর্ভুক্ত। কাল পাথরের কাছে শাযরাওয়ান মাটির সাথে মিশে গেছে। এখানে ধোকা লাগে। যে এর উপর দিয়ে তওয়াফ করে, তার তওয়াফও হয় না। কেননা, সে যেন কাবার অভ্যন্তরে তওয়াফ করে। অথচ কাবার বাইরে তওয়াফ করার আদেশ রয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, শাযরাওয়ান কাবা প্রাচীর প্রস্থ। প্রাচীর তৈরী করার সময় এই প্রস্থটি ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এই পরিত্যক্ত প্রস্থকে শাযরাওয়ান বলা হয়। মোট কথা, কাল পাথরের নিকট থেকে তওয়াফ শুরু করবে।

(৩) তওয়াফের শুরুতে অর্থাৎ, কাল পাথর থেকে সামনে আগমনের পূর্বেই এই দোয়া পড়বে–

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র নামে শুরু। আল্লাহ মহান। হে আল্লাহ, আমি এই তওয়াফ করছি তোমার প্রতি বিশ্বাসের কারণে, তোমার কিতাবকে সত্য মনে করার কারণে, তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ করার লক্ষ্যে এবং তোমার নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সুন্নত অনুসরণ করার কারণে। এরপর তওয়াফ শুরু করে কাল পাথর থেকে এগিয়ে কাবা গৃহের বিপরীতে পৌঁছবে । তখন

এই দোয়া বলবে–

اَللّٰهُمَّ هٰذَا الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَهٰذَا الْحَرَمُ حَرَمُكَ وَهٰذَا الْاَمْنُ اَمْنُكَ وَهٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! এই গৃহ তোমার গৃহ, এই হরম তোমার হরম, এই আশ্রয় তোমার আশ্রয়। এটা দোযখ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনাকারীর স্থান। স্থান বলার সময় মকামে ইবরাহীমের দিকে ইশারা করে বলবে–

اَللّٰهُمَّ اِنَّ بَيْتَكَ عَظِيْمٌ وَوَجْهَكَ كَرِيْمٌ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ فَاَعِذْنِيْ مِنَ النَّارِ وَمِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ وَحَرِّمْ لَحْمِيْ وَدَمِيْ عَلَى النَّارِ وَاٰمِنِّيْ مِنْ اَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاكْفِنِيْ مُؤْنَةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তোমার গৃহ মহান এবং তোমার সত্তা কৃপাশীল। তুমি সেরা রহমতকারী। অতএব আমাকে দোযখ থেকে এবং বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় দান কর। আমার রক্ত মাংসকে দোযখের জন্যে হারাম করে দাও। আমাকে কেয়ামত দিবসের ত্রাস থেকে আশ্রয় দাও এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা কর। অতঃপর সোবহানাল্লাহ ও আলহামদু লিল্লাহ বলতে বলতে রোকনে এরাকীতে পৌঁছবে। তখন এই দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشِّرْكِ وَالشَّكِّ وَالْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ وَالشِّقَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে শেরক, সন্দেহ, কুফর, নেফাক, বিভেদ, দুশ্চরিত্রতা থেকে এবং পরিবার, ধন-সম্পদ ও সন্তানের মধ্যে কুদৃশ্য দেখা থেকে। অতঃপর মীযাবে পৌঁছে বলবে–

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنَا تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ
اَللّٰهُمَّ اَسْقِنِىْ بِكَاسِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً
لَاَظْمَاُ بَعْدَهَا اَبَدًا ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে তোমার আরশের ছায়ায় স্থান দাও, যে দিন তোমার আরশের ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। হে আল্লাহ! আমাকে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পেয়ালা দিয়ে শরবত পান করাও, যাতে আমার পিপাসা চিরতরে নিবৃত্ত হয়ে যায়। অতঃপর রোকনে শামীর বিপরীতে পৌঁছে বলবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَسَعْيًا مَشْكُوْرًا وَذَنْبًا
مَغْفُوْرًا وَتِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفُوْرُ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ
وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি একে পরিণত কর মকবুল হজ্জ, কৃতজ্ঞ সায়ী (দৌড়), মার্জনাকৃত গোনাহ ও এমন ব্যবসায়, যাতে কখনও লোকসান হয় না। হে পরাক্রান্ত, হে ক্ষমাশালী! হে পরওয়ারদেগার! ক্ষমা কর, রহম কর। তুমি যে গোনাহ জান, তা মার্জনা কর। নিশ্চয় তুমি অধিক সম্মানী ও মহৎ। রোকনে ইয়ামানীর বিপরীতে পৌঁছে বলবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ
وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَاَعُوْذُ بِكَ
مِنَ الْخِزْيِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি কুফর থেকে। আরও আশ্রয় চাই দারিদ্র্য, কবরের আযাব, জীবন ও মরণের পরীক্ষা থেকে এবং আশ্রয় চাই তোমার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের লাঞ্ছনা থেকে। রোকনে ইয়ামানী ও কাল পাথরের মাঝখানে পৌঁছে বলবে–

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ
حَسَنَةً وَّقِنَا بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْقَبْرِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

অর্থাৎ, হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ ও পরকালে কল্যাণ দান কর। আপন রহমতে আমাদেরকে কবর এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর। অতঃপর কাল পাথরের কাছে পৌঁছে বলবে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ بِرَحْمَتِكَ اَعُوْذُ بِرَبِّ هٰذَا الْحَجَرِ مِنَ
الدَّيْنِ وَالْفَقْرِ وَضِيْقِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আপনার রহমতে আমাকে ক্ষমা করুন। আমি এই পাথরের পরওয়ারদেগারের কাছে আশ্রয় চাই ঋণ থেকে, মনের সংকীর্ণতা থেকে এবং কবরের আযাব থেকে।

এভাবে এক চক্কর পূর্ণ হল। এমনিভাবে সাত চক্কর দেবে এবং প্রত্যেক চক্করে উপরোক্ত দোয়াসমূহ যথারীতি পাঠ করবে।

(৪) প্রথম তিন চক্করে রমল করবে। অবশিষ্ট চার চক্করে স্বাভাবিক চলবে। রমলের অর্থ দ্রুত চলা এবং কাছে কাছে পা রাখা। এটা দৌড়ের চেয়ে কম এবং গতিতে স্বাভাবিক চলার চেয়ে বেশী। এস্তেবাগ ও রমল করার উদ্দেশ্য নির্ভীকতা এবং বীরত্ব প্রদর্শন করা। কাফেরদেরকে নিরাশ করার জন্যে প্রথম যুগে এটা প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু পরেও এ সুন্নত অব্যাহত রয়ে গেছে। রমল কাবা ঘরের সন্নিকটে করা উত্তম। কিন্তু ভীড়ের কারণে তা সম্ভব না হলে দূরত্ব থেকে রমল করাই ভাল। অর্থাৎ, তওয়াফের স্থানের কিনারে রমল করবে এবং তিন চক্কর রমল করার পর কাবা গৃহের সন্নিকটে ভীড়ের মধ্যে মিশে যাবে। অতঃপর স্বাভাবিক গতিতে চার চক্কর দেবে। প্রত্যেক চক্করে কাল পাথর চুম্বন করতে পারলে ভাল। ভীড়ের কারণে তা সম্ভব না হলে হাতে কাল পাথরের দিকে ইশারা করে হাত চুম্বন করবে। এমনিভাবে রোকনে ইয়ামানীকে চুম্বন করা মোস্তাহাব। রসূলুল্লাহ (সাঃ) রোকনে ইয়ামানী চুম্বন করতেন এবং আপন গণ্ড তার উপর রাখতেন। তবে কাল পাথর চুম্বন করা এবং রোকনে ইয়ামানীকে কেবল হাতে স্পর্শ করা উত্তম। কারণ, এ রেওয়ায়েতেই

বেশী প্রসিদ্ধ।

(৫) তওয়াফের সাতটি চক্কর সমাপ্ত হয়ে গেলে মুলতাযামে, অর্থাৎ কাল পাথর এবং কাবা গৃহের দরজার মধ্যবর্তী স্থানে আগমন করবে। এটা দোয়া কবুল হওয়ার স্থান। এখানে প্রাচীরের সাথে চিমটে যাবে। পর্দা ধরে নিজের পেট প্রাচীরের সাথে মিলিয়ে দেবে। ডান গণ্ড প্রাচীরে রাখবে এবং হাত ও হাতের তালু তাতে ছড়িয়ে দেবে। এ সময় নিম্নোক্ত দোয়া করবে–

"হে প্রাচীন গৃহের প্রভু! আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত কর। আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় দাও। আমাকে প্রত্যেক মন্দ কাজ থেকে রক্ষা কর। আমাকে সন্তুষ্ট কর তোমার দেয়া রিযিকের উপর এবং আমাকে দেয়া তোমার রিযিকে বরকত দান কর। হে আল্লাহ! এ গৃহ তোমার গৃহ, এ বান্দা তোমার বান্দা এবং এটা জাহান্নাম থেকে আশ্রয়প্রার্থীর স্থান। হে আল্লাহ্! আমাকে তুমি তোমার কাছে আগমনকারীদের মধ্যে অধিক সম্মানিত কর।"

এর পর এ স্থানে বেশী পরিমাণে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করবে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সকল পয়গম্বরের প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে, নিজের বিশেষ মকসূদের জন্যে দোয়া এবং গোনাহের মাগফেরাত কামনা করবে। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এ স্থানে খাদেমদেরকে বলতেন ঃ আমার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাও, যাতে আমি পরওয়ারদেগারের সামনে নিজের গোনাহসমূহের স্বীকারোক্তি করতে পারি।

(৬) মুলতাযামে করণীয় সমাপ্ত হলে মকামে ইবরাহীমের পেছনে দু'রাকআত নামায পড়বে। পথম রাকআতে কুল ইয়াআইউহাল কা-ফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে কুল হুআল্লাহ পাঠ করবে। এটা তওয়াফের দু'রাকআত। যুহরী বলেন ঃ চিরাচরিত সুন্নত এটাই যে, প্রত্যেক সাত চক্কর শেষে দু'রাকআত নামাযে পড়বে। যদি অনেক তওয়াফ করে এবং সবগুলোর পরে দু'রাকআত নামায পড়ে নেয়, তাও জায়েয। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরূপ করেছেন। সাত চক্কর মিলে এক তওয়াফ হয়। তওয়াফের দু'রাকআত পড়ার পর নিম্নরূপ দোয়া বলবে–

"হে আল্লাহ! সহজ করে দাও আমার জন্যে কঠিন বিষয়, আমাকে রক্ষা কর কঠিন বিষয় থেকে এবং আমাকে ইহ ও পরকালে ক্ষমা কর।

হে আল্লাহ! আমাকে আপন কৃপায় গোনাহ্ থেকে রক্ষা কর, যাতে তোমার নাফরমানী না করি, আমাকে তোমার তওফীক দ্বারা আনুগত্যে সাহায্য কর, আমাকে তোমার নাফরমানী থেকে আলাদা রাখ এবং আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর, যারা তোমাকে, তোমার ফেরেশতাগণকে, তোমার রসূলগণকে এবং তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদেরকে ভালবাসে। হে আল্লাহ! আমাকে তোমার ফেরেশতাগণের, রসূলগণের ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণের প্রিয় কর। হে আল্লাহ! তুমি যেমন আমাকে ইসলামের দিকে পথ প্রদর্শন করেছ, তেমনি আপন কৃপায় ও ক্ষমতাবলে আমাকে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। আমার দ্বারা আপন আনুগত্য ও রসূলের আনুগত্যের কাজ নাও এবং আমাকে এমন ফেতনা থেকে আশ্রয় দাও, যার কোন প্রতিকার নেই।"

অতঃপর কাল পাথরের কাছে পুনরায় আসবে এবং সেটি চুম্বন করে তওয়াফ শেষ করবে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি সাত চক্কর দিয়ে কাবা গৃহের তওয়াফ করে এবং দু'রাকআত নামায পড়ে, সে একটি ক্রীতদাস মুক্ত করার সওয়াব পায়। এ পর্যন্ত তওয়াফের পদ্ধতি বর্ণিত হল। এতে নামাযের শর্তসমূহ ছাড়া আরও ওয়াজেব এই যে, সমগ্র কা'বার চার পাশে সাত চক্কর পূর্ণ করতে হবে। কাল পাথর থেকে শুরু করতে হবে এবং কাবা গৃহকে বাম দিকে রেখে মসজিদের ভিতরে এবং কাবার বাইরে তওয়াফ করতে হবে। সবগুলো চক্কর নিরন্তর করতে হবে। মামুলী ফাঁকের বেশী ফাঁক দেয়া যাবে না। এ ছাড়া আর যেসব বিষয় রয়েছে, সেগুলো সুন্নত ও মোস্তাহাব।

সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে দৌড়ানো

তওয়াফ শেষ করার পর বাবে সাফা দিয়ে বাইরে যাবে। এটা রোকনে ইয়ামানী ও কাল পাথরের মধ্যবর্তী প্রাচীরের সোজাসুজি একটি দরজা। এ দরজা দিয়ে বের হয়ে সাফা পাহাড়ে পৌছবে। এর কয়েকটি সিঁড়ি অতিক্রম করার পর কাবা গৃহ দৃষ্টিগোচর হবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পর্যন্ত কা'বা গৃহ দৃষ্টিগোচর না হওয়া পর্যন্ত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেন। সাফা পাহাড়ের গোড়া থেকে দৌড়ানো তথা 'সায়ী' শুরু করা যথেষ্ট।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে আরোহণ করা মোস্তাহাব। কিছু সিঁড়ি নতুন তৈরী হয়েছে, সেগুলোও বাদ দেবে না। বাদ দিলে 'সায়ী' পূর্ণ হবে না। (অধুনা সাফা পাহাড়ের গোড়ায় এত বেশী মাটি জমে গেছে যে, গোড়া থেকে এবং দু'এক সিঁড়ি উপরে উঠলেও কা'বা দৃষ্টিগোচর হয়। কাজেই এখন সিঁড়িতে না চড়লেও সায়ী অপূর্ণ থাকার সম্ভাবনা নেই।) সাফা থেকে সায়ী শুরু করে সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাত বার সায়ী করবে। সাফা পাহাড়ে আরোহণের সময় কা'বার দিকে মুখ করে যে দোয়া পড়া হয় তা নিম্নরূপ–

"আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। কারণ তিনি আমাদেরকে হেদায়াত করেছেন। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। সাম্রাজ্য তাঁরই। প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। কল্যাণ তাঁর হাতেই। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি এক। তিনি আপন ওয়াদা পালন করেছেন, আপন বান্দাকে সাহায্য করেছেন (অর্থাৎ, মক্কা বিজয়ে), আপন বাহিনীকে জয়ী করেছেন এবং একা কাফের বাহিনীকে পরাজিত করেছেন (অর্থাৎ, খন্দক যুদ্ধে), আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তাঁর জন্যে এবাদতকে খাঁটি কর। যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তাঁর জন্যে এবাদতকে খাঁটি কর। সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব-পালক আল্লাহর জন্যে। আল্লাহ্ পবিত্র। স্মরণ কর তাঁকে সন্ধ্যায় ও দুপুরে। তাঁরই প্রশংসা আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে সন্ধ্যায় এবং দ্বিপ্রহরে। তিনি জীবিতকে বের করেন মৃত থেকে এবং মৃতকে জীবিত থেকে। ভূমি মরে যাওয়ার পর তাকে জীবিত করেন, এমনিভাবে তোমরা উত্থিত হবে। তার অন্যতম নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছ। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চিরস্থায়ী ঈমান, সত্যিকার বিশ্বাস, উপকারী জ্ঞান, বিনয়ী অন্তর ও যিকিরকারী জিহ্বা প্রার্থনা করি। আরও প্রার্থনা করি ক্ষমা, নিরাপত্তা এবং ইহ ও পরকালীন স্থায়ী শান্তি।"

অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে এবং ইচ্ছা অনুযায়ী দোয়া করবে। এর পর নেমে সায়ী শুরু করবে এবং বলতে থাকবে–

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

অর্থাৎ, হে পরওয়ারদেগার! ক্ষমা কর, রহম কর এবং যে গোনাহ্ তুমি জান তা মার্জনা কর। নিশ্চয় তুমি সম্মানিত! দানশীল। হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়াতে এবং আখেরাতে কল্যাণ দান কর। আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর।

অতঃপর সবুজ মাইল ফলক পর্যন্ত নম্রতা বজায় রেখে চলবে। সাফা পাহাড় থেকে নেমেই এই মাইল ফলক পাওয়া যায়। মসজিদে হারামের দিকে আসতে গিয়ে যখন ছয় হাত দূরত্ব থেকে যায়, তখন দ্রুত চলবে। অর্থাৎ, রমলের মত গতিতে চলবে। পরবর্তী মাইল ফলক পর্যন্ত এভাবেই চলবে। অতঃপর ধীরগতিতে চলবে। মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছে তার সিঁড়িতে চড়বে, যেমন সাফা পাহাড়ে চড়েছিলে। এখানে সাফা পাহাড়ে যে দোয়া পড়েছিলে, সে দোয়াই পড়বে। এটা হল সায়ী। পুনরায় যখন সাফা পাহাড়ে যাবে, তখন দু'বার সায়ী হবে। এমনিভাবে সাত বার সায়ী করবে। প্রত্যেক সায়ীতে দু'টি মাইল ফলকের মাঝখানে রমল করবে। সায়ী সমাপ্ত হওয়ার পর বুঝতে হবে, দু'টি কাজ অর্থাৎ, তওয়াফ ও সায়ী সমাপ্ত হল। উভয়টি সুন্নত। সায়ী করার সময় ওযু থাকা মোস্তাহাব– ওয়াজেব নয়। আরাফাতে অবস্থানের পূর্বে সায়ী করলে এটাই রোকন হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট। কেননা, সায়ী আরাফাতে অবস্থানের পরে হওয়া শর্ত নয়; বরং এটা তওয়াফে যিয়ারতের জন্যে শর্ত। তবে তওয়াফের পরে সায়ী করা শর্ত।

আরাফাতে অবস্থান

যদি হাজী আরাফার দিনে আরাফাতে পৌঁছে, তবে তওয়াফে কুদুম ও মক্কায় প্রবেশের প্রস্তুতি আরাফাতে অবস্থানের পূর্বে করবে না। বরং প্রথমে আরাফাতে অবস্থান করবে। আরাফার কয়েক দিন পূর্বে পৌঁছালে মক্কায় প্রবেশ করে তওয়াফে কুদুম করবে এবং যিলহজ্জ পর্যন্ত এহ্‌রাম

অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করবে। ইমাম এই তারিখেই যোহরের পরে কাবার নিকটে খোতবা দেবেন এবং হাজীদেরকে আদেশ দেবেন ৮ই যিলহজ্জ তারিখে মিনায় যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যে। হাজীগণ ৯ই যিলহজ্জ ভোরে সেখান থেকে আরাফায় যাবে। দ্বিপ্রহরের পরে আরাফাতে অবস্থানের ফরয আদায় করবে। কেননা, আরাফাতে অবস্থানের সময় ৯ই যিলহজ্জ দ্বিপ্রহরের পর থেকে ১০ই যিলহজ্জ সোবহে সাদেক পর্যন্ত। হজ্জের ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনের জন্যে সামর্থ্য থাকলে মক্কা থেকে শেষ অবধি পদব্রজে চলা মোস্তাহাব। মসজিদে ইবরাহীম (আঃ) থেকে অবস্থানের স্থান পর্যন্ত পদব্রজে চলার তাকিদ আছে। এটা উত্তম।

হাজীগণ মিনায় পৌঁছে এই দোয়া পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ هٰذَا مِنًى فَامْنُنْ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهٖ عَلٰى اَوْلِيَائِكَ وَاَهْلِ طَاعَتِكَ ـ

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! এটা মিনা। অতএব তুমি আমার প্রতি সেই নেয়ামত দ্বারা অনুগ্রহ কর, যদ্দ্বারা তুমি তোমার ওলী ও আনুগত্যশীলদের প্রতি অনুগ্রহ করেছ।"

নয় তারিখের রাতে মিনায় অবস্থান করবে। এ সময়ের সাথে হজ্জের কোন কাজ সম্পৃক্ত নয়। ভোর হলে ফজরের নামায পড়বে এবং সাবীর পাহাড়ের উপরে সূর্য উঠে গেলে এই দোয়া পড়ে আরাফাতে রওয়ানা হয়ে যাবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا خَيْرَ غَدْوَةٍ وَقَدْوَتَهَا قَطُّ وَاقْرِبْهَا مِنْ رِضْوَانِكَ اَبْعِدْهَا مِنْ سَخَطِكَ اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ غَدَوْتُ وَاِيَّاكَ رَجَوْتُ وَعَلَيْكَ اِعْتَمَدْتُ وَوَجْهَكَ اَرَدْتُ فَاجْعَلْنِيْ مِمَّنْ تُبَاهِيْ بِهِ الْيَوْمَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ وَاَفْضَلُ ـ

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! এ ভোর আমার সকল ভোর অপেক্ষা উত্তম কর। একে তোমার সন্তুষ্টির নিকটবর্তী কর, তোমার ক্রোধ থেকে দূরবর্তী কর। হে আল্লাহ! আমি তোমার দিকে ভোর করেছি, তোমাকেই আশা

করেছি, তোমার উপরই ভরসা করেছি এবং তোমার সত্তারই ইচ্ছা করেছি। অতএব আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর, যাদের নিয়ে তুমি আজ ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করবে।"

আরাফাতে পৌঁছে নামেরা মসজিদের সন্নিকটে তাঁবু স্থাপন করবে। এখানেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁবু স্থাপন করেছিলেন। আরাফাতে অবস্থানের জন্যে গোসল করা উচিত। সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লে ইমাম সংক্ষিপ্ত খোতবা পাঠ করে বসে যাবেন, অতঃপর দ্বিতীয় খোতবা শুরু করবেন। মুয়ায্যিন আযান দেবে। আযানে দুই তকবীর মিলিয়ে বলবে। তকবীর শেষে ইমাম খোতবা শেষ করে যোহর ও আসর এক আযান ও দু'তকবীর সহকারে পড়বে। নামায কসর পড়বে। নামাযের পর অবস্থানস্থলে গিয়ে আরাফাতে অবস্থান করবে– আরনা উপত্যকায় অবস্থান করবে না। মসজিদে ইবরাহীমের সম্মুখবর্তী অংশ আরনার এবং পশ্চাতের অংশ আরাফাতের অন্তর্ভুক্ত। মসজিদে আরাফাতের স্থান সেখানে বিছানো বড় বড় পাথর দ্বারা জানা যায়। অবস্থানের সময় আল্লাহর প্রশংসা, দোয়া ও তওবা বেশী পরিমাণে করবে। সেদিন রোযা রাখবে না, যাতে সারাদিন দোয়া পাঠ করার শক্তি থাকে। আরাফার দিনে লাব্বায়কা বলা বন্ধ করবে না; রবং কখনও লাব্বায়কা বলবে এবং কখনও দোয়ায় মগ্ন থাকবে। সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফাতের ময়দান ত্যাগ করা উচিত নয়, যাতে সে রাতও দ্বিতীয় দিনের রাত আরাফাতেই একত্রিত হয়। এর দ্বিতীয় উপকার এই যে, চাঁদ দেখায় ভুল হলে কিছু সময় আরাফাতে অবস্থান হয়ে যাবে। যেব্যক্তি দশই যিলহজ্জ ভোর পর্যন্ত আরাফাতে অবস্থান করতে পারে না, তার হজ্জ বাতিল হয়ে যায়। তার উচিত ওমরার ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করে এহরাম ছেড়ে দেয়া এবং পরবর্তী বছর হজ্জের কাযা করা।

আরাফার দিনে সর্বাধিক সময় দোয়ায় ব্যয় করবে। কারণ, এ স্থানে ও এরূপ সমাবেশে দোয়া কবুলের আশা করা যায়। আরাফার দিনে যেসব দোয়া রসূলে করীম (সাঃ) ও পূর্ববর্তী মনীষীগণ থেকে বর্ণিত আছে সেগুলো পড়া উচিত। এরূপ একটি দোয়ার সারমর্ম নিম্নরূপ–

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। সাম্রাজ্য তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি চিরজীবী– মৃত্যুবরণ করেন না। তাঁরই হাতে কল্যাণ।

তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আমার অন্তরে নূর দাও, আমার কানে নূর দাও, আমার চোখে নূর দাও, আমার জিহ্বায় নূর দাও। হে আল্লাহ, আমার বক্ষ উন্মোচন কর এবং আমার কর্ম আমার জন্যে সহজ কর। হে আল্লাহ! প্রশংসার মালিক, তোমারই প্রশংসা যেমন আমরা করে থাকি। বরং তার চেয়েও উত্তম প্রশংসা তোমার। তোমারই জন্যে আমার নামায, আমার হজ্জ, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু। তোমারই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন এবং তোমারই দিকে আমার সওয়াব। হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে মনের কুমন্ত্রণা, দুরবস্থা এবং কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে সে বস্তুর অনিষ্ট থেকে যা বাতাস বয়ে আনে এবং যমানার ধ্বংসাত্মক বস্তুর অনিষ্ট থেকে। হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে তোমার দেয়া সুস্থতার বিবর্তন থেকে, তোমার আকস্মিক প্রতিশোধ থেকে এবং তোমার যাবতীয় ক্রোধ থেকে। হে আল্লাহ! আমাকে সৎপথ প্রদর্শন কর এবং আমাকে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা কর। আজ সন্ধ্যায় আমাকে এমন নেয়ামত দান কর, যা আপন সৃষ্টির মধ্য থেকে কাউকে এবং আপন গৃহের হাজীদের মধ্য থেকে কাউকে দান করনি। হে সর্বশ্রেষ্ঠ রহমকারী, হে আল্লাহ! হে মর্যাদা বৃদ্ধিকারী, অনুগ্রহ প্রেরণকারী, হে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর স্রষ্টা, তোমার সামনে মানুষ বিভিন্ন ভাষায় ফরিয়াদ করে। তোমার কাছে আমরা প্রয়োজন যাঞ্ছা করি। আমার প্রয়োজন এই যে, আমাকে এই পরীক্ষাগারে ভুলো না, যখন দুনিয়ার মানুষ আমাকে ভুলে যায়। হে আল্লাহ! তুমি আমার কথা শুন, আমার অবস্থান দেখ, আমার গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জান, আমার কোন বিষয় তোমার কাছে গোপন নয়। আমি বিপদগ্রস্ত, নিঃস্ব ফরিয়াদী, আশ্রয়প্রার্থী, ভীত, সন্ত্রস্ত, গোনাহ্ স্বীকারকারী, আমি তোমার কাছে মিসকীনের মত প্রার্থনা করি এবং তোমার সামনে গোনাহ্গার লাঞ্ছিতের মত মিনতি করি, ভীত ক্ষতিগ্রস্তের ন্যায় তোমাকে ডাকি, এমন ব্যক্তির ন্যায়, যার গর্দান তোমার উদ্দেশে নত হয়, যার অশ্রু তোমার জন্যে প্রবাহিত হয়, যার দেহ তোমার জন্যে নুয়ে পড়ে এবং যার নাক তোমার জন্যে ধুলাধূসরিত হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার দয়া থেকে বঞ্চিত করো না, তুমি আমার জন্যে মেহেরবান ও দয়ালু হও হে উত্তম দাতা। ইলাহী, আমি তো নিজেকে তিরস্কার করি। ইলাহী, পাপ আমার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে, অতঃপর

আমার আমলের কোন ওসিলা নেই এবং প্রত্যাশা ব্যতীত আমার কোন সুপারিশকারী নেই। ইলাহী, আমি জানি আমার গুনাহ তোমার কাছে আমার কোন মর্যাদা বাকী রাখেনি এবং ওযর করার কোন পথ অবশিষ্ট রাখেনি, কিন্তু তুমি দাতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ইলাহী, যদি আমি তোমার রহমত পর্যন্ত পৌঁছার যোগ্য নাও হই, তবুও তোমার রহমত তো আমার কাছে পৌঁছার যোগ্য। ইলাহী, তোমার রহমত সকল সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত এবং আমিও এক সৃষ্টি। ইলাহী, আমার গোনাহ যদিও বৃহৎ, কিন্তু তোমার ক্ষমার তুলনায় নেহায়েত ক্ষুদ্র। অতএব আমার গোনাহসমূহ মাফ কর হে কৃপাশীল। ইলাহী, তুমি তো তুমিই আর আমি আমিই। আমি বার বার গোনাহের দিকে ফিরে যাই, আর তুমি বার বার মাগফেরাতের দিকে ফিরে যাও। ইলাহী, যদি তুমি তোমার আনুগত্যশীলদের ছাড়া কারও প্রতি রহম না কর, তবে গোনাহ্গাররা কার কাছে কাকুতি-মিনতি করবে? ইলাহী, আমি তোমার আনুগত্য থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে নিবৃত্ত রয়েছি এবং তোমার নাফরমানীতে জেনেশুনে রত হয়েছি। অতএব তুমি পবিত্র, আমার উপর তোমার প্রমাণ কত বৃহৎ এবং তোমার ক্ষমা আমার প্রতি কত বড় আশীর্বাদ! আমি তোমার মুখাপেক্ষী, তুমি আমা থেকে বেপরওয়া। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমাই কর। হে তাদের উত্তম যাদেরকে দোয়াকারী ডাকে, হে তাদের শ্রেষ্ঠ, যাদের কোন প্রত্যাশাকারী প্রত্যাশা করে, ইসলামের ইযযত ও মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দায়িত্বকে আমি তোমার সামনে ওসিলা করছি। অতএব আমার সমস্ত গোনাহ্ মাফ কর। আমাকে এই জায়গা থেকে প্রয়োজন মিটিয়ে বিদায় দাও। আমি যা চেয়েছি, তা আমাকে দান কর। আমি যে বিষয়ের বাসনা করেছি তা পূরণ কর। ইলাহী, আমি সে দোয়া করছি যা তুমি শিখিয়েছ। অতএব আমাকে সে আশা থেকে বঞ্চিত করো না, যা তুমি আমাকে বলেছ। ইলাহী, তুমি আজ রাতে সে বান্দার সাথে কি ব্যবহার করবে, যে আপন গোনাহ্ স্বীকার করে তোমার কাছে বিনয় প্রকাশ করে, আপন গোনাহের কারণে মিসকীন, আপন আমলের কারণে তোমার সামনে মিনতি করে, তোমার প্রতি তওবা করে, জুলুম করার কারণে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, ক্ষমার জন্যে তোমার কাছে কান্নাকাটি করে, অভাব দূরীকরণে তোমাকে অন্বেষণ করে, আপন অবস্থানের জায়গায় তোমার কাছে প্রত্যাশা করে, অথচ তার

গোনাহ অনেক। হে আশ্রয়স্থল প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তির, প্রত্যেক মুমিনের বন্ধু, যে সৎকাজ করে সে তোমার রহমতে সফল হয় এবং যে গোনাহ্ করে, সে তার গোনাহের কারণে বরবাদ হয়। হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছেই এসেছি, তোমার আঙ্গিনায় অবস্থান করছি, তোমাকেই আশা করছি, তোমার কাছে যা আছে তা তলব করছি, তোমার অনুগ্রহ কামনা করছি, তোমার রহমত আশা করছি, তোমার শাস্তিকে ভয় করছি, তোমারই কাছে গোনাহের বোঝা নিয়ে পালিয়ে এসেছি, তোমার সম্মানিত গৃহের হজ্জ করেছি। হে সেই সত্তা! যে প্রার্থনাকারীদের প্রয়োজনসমূহের মালিক এবং যে নিশ্চুপদের মনের কথা জানে, হে সেই সত্তা, যার সাথে আর কোন প্রভু নেই, যার কাছে দোয়া করা যায় এবং যার কোন স্রষ্টা নেই, যাকে ভয় করা যায়।

হে সেই সত্তা, বেশী সওয়াল করলে যার দানশীলতাই কেবল বৃদ্ধি পায় এবং বেশী প্রয়োজন হলে যার অনুগ্রহ ও কৃপাই শুধু বেড়ে যায়। হে আল্লাহ! তুমি প্রত্যেক মেহমানের জন্যে ভোজ রেখেছ। আমরা তোমার মেহমান। অতএব আমাদের জন্যে জান্নাতী ভোজের ব্যবস্থা কর। হে আল্লাহ! প্রত্যেক প্রতিনিধি দলের জন্যে একটি পুরস্কার রয়েছে, প্রত্যেক যিয়ারতকারীর জন্যে এক সম্মান রয়েছে, প্রত্যেক সওয়ালকারীর জন্যে এক দান রয়েছে, প্রত্যেক আশাকারীর জন্যে এক সওয়াব রয়েছে, প্রত্যেক আবেদনকারীর জন্যে এক প্রতিদান রয়েছে, প্রত্যেক রহমকারীর জন্যে এক রহমত রয়েছে, প্রত্যেক আগ্রহীর জন্যে তোমার কাছে নৈকট্য রয়েছে এবং প্রত্যেক ওসিলা অন্বেষণকারীর জন্যে ক্ষমা রয়েছে। আমরা প্রতিনিধি হয়ে এসেছি তোমার সম্মানিত গৃহের দিকে, আমরা অবস্থান করেছি মহান স্থানসমূহে এবং উপস্থিত হয়েছি এসব বরকতময় ভূমিতে, তোমার কাছে যা আছে তার আশা নিয়ে। অতএব তুমি প্রত্যাশাকে বিফল করো না।

ইলাহী, তুমি একের পর এক এত নেয়ামত দিয়েছ যাতে আমাদের মন শান্ত হয়ে গেছে। তুমি চিন্তার স্থান এত ব্যাপক করেছ যে, নির্বাক বস্তুসমূহ তোমার প্রমাণ উচ্চারণে মুখর হয়ে রয়েছে। তুমি এত অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছ যে, তোমার ওলীগণও তোমার হক আদায়ে অক্ষমতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। তুমি এত নিদর্শনাবলী প্রকাশ করেছ যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী তোমার অস্তিত্বের প্রমাণসমূহ বর্ণনা করেছে। তুমি

তোমার কুদরত দ্বারা এমনভাবে সকল বস্তুকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছ যে, প্রত্যেক বস্তু তোমার ইযযতের সামনে মাথা নত করেছে এবং সকল মুখমণ্ডল তোমার মাহাত্ম্যের মোকাবিলায় নত হয়ে গেছে। তোমার বান্দারা যখন অসৎ কাজ করে তখন তুমি সহ্য কর এবং সময় দাও। পক্ষান্তরে তারা সৎকাজ করলে তুমি কৃপা কর ও কবুল কর। তারা নাফরমানী করলে তুমি গোপন কর। তারা ত্রুটি করলে তুমি ক্ষমা কর। আমরা দোয়া করলে তুমি কবুল কর আর ডাকলে শ্রবণ কর। আমরা তোমার প্রতি মনোযোগী হলে তুমি নিকটবর্তী হও। আর তোমার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে তুমি আমাদের আহ্বান কর। ইলাহী, তুমি তোমার প্রকাশ্য কিতাবে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে বলেছ ঃ কাফেরদেরকে বল, তারা কুফর থেকে বিরত হলে তাদের অতীত কুকর্ম ক্ষমা করা হবে। সুতরাং অস্বীকারের পর তাদের তরফ থেকে কলেমায়ে তওহীদের স্বীকারোক্তিতে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। আমরা তো তওহীদের সাক্ষ্য বিনীতভাবে এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর রেসালতের সাক্ষ্য আন্তরিকতা সহকারে দেই। অতএব এই সাক্ষ্যের বিনিময়ে আমাদের অতীত গোনাহসমূহ মাফ করে দাও। এতে আমাদের অংশ নও-মুসলিমদের অংশ থেকে কম করো না। ইলাহী, আমাদের কেউ তার গোলাম মুক্ত করে তোমার নৈকট্য হাসিল করলে তুমি তা পছন্দ কর। আমরা তো তোমার গোলাম; আর তুমি অনুগ্রহ করার অধিক যোগ্য। অতএব আমাদেরকে মুক্ত কর, তোমার আদেশ– আমরা যেন আমাদের মধ্যকার গরীব মিসকীনদেরকে খয়রাত দেই। আমরা তোমার কাছে মিসকীন এবং তুমি খয়রাত দানের অধিক যোগ্য। অতএব আমাদেরকে খয়রাত দাও। যারা আমাদের উপর জুলুম করে, তাদেরকে ক্ষমা করার উপদেশ তুমি আমাদেরকে দিয়েছ। আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। আর তুমি কৃপা করার অধিক হকদার, অতএব আমাদেরকে মার্জনা কর। পরওয়ারদেগার, আমাদেরকে দুনিয়াতে এবং আখেরাতে কল্যাণ দাও। আপন রহমত দ্বারা তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও।

এছাড়া খিযির (আঃ)-এর দোয়াও বেশী পরিমাণে পাঠ করবে। তা এই–

يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ شَانٌ عَنْ شَانٍ وَلَا سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ

وَلَاتَشْتَبِهُ عَلَيْهِ الْاَصْوَاتُ يَا مَنْ لَاتُغْلِطُهُ الْمَسَائِلُ وَلَاتَخْتَلِفُ عَلَيْهِ اللُّغَاتُ يَا مَنْ لَايُبْرِمُهُ الْحَاجُّ الْمَحِيْنِ وَلَاتُضْجِرُهُ مَسْئَلَةُ السَّائِلِيْنَ اَذِقْنَا بَرْدَ عَفْوِكَ وَحَلَاوَةَ رَحْمَتِكَ ـ

অর্থাৎ, হে সেই সত্তা, যাঁকে তার এক অবস্থা অন্য অবস্থা থেকে উদাসীন করে না, এক আবেদন অন্য আবেদন শুনা থেকে গাফেল করে না এবং যার কাছে অনেক কণ্ঠস্বর বিমিশ্র হয় না। হে সেই সত্তা, যাঁকে অনেক আবেদন বিরত করে না এবং যাঁর কাছে অনেক ভাষা বিভিন্ন নয়। হে সেই সত্তা! যাঁকে ঠকায় না হটকারীদের পীড়াপীড়ি এবং যাঁকে অনেক আবেদনকারীর আবেদন বিমর্ষ করে না, তুমি আমাদেরকে তোমার ক্ষমার শীতলতা এবং রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাও।

এছাড়া আরও দোয়া জানা থাকলে তা পড়বে। (এ ক্ষেত্রে "হেযবুল আমরের" দোয়া খুব চমৎকার। এতে কোরআন ও হাদীসের দোয়া শামিল রয়েছে।) নিজের জন্যে, পিতামাতার জন্যে এবং সকল মুসলমান নারী ও পুরুষের মাগফেরাতের জন্যে খুব আগ্রহ সহকারে দোয়া করবে। আল্লাহ তাআলার কাছে কোন কিছুই বড় নয়। মুতরিফ ইবনে আবদুল্লাহ্ আরাফাতে বলেছিলেন ঃ ইলাহী, তুমি আমার কারণে সকল মানুষের আবেদন নামঞ্জুর করো না। বকর মুযানীর কাছে জনৈক ব্যক্তি বলল ঃ আমি আরাফাতের হাজীদেরকে দেখে ধারণা করলাম, আমি তাদের মধ্যে না থাকলে সকলেরই মাগফেরাত হয়ে যেত।

অবস্থানের পরবর্তী করণীয় বিষয়

আরাফাতে অবস্থানের পরবর্তী করণীয় হচ্ছে মুযদালেফায় অবস্থান, জামরায় কংকর নিক্ষেপ, যবেহ করা, কেশ মুণ্ডন ও তওয়াফ করা।

সূর্যাস্তের পর আরাফাত থেকে ফেরার পথে গাম্ভীর্য ও স্থিরতা অবলম্বন করা উচিত। কতক লোকের রীতি অনুযায়ী ঘোড়া অথবা উট দৌড়ানো উচিত নয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সওয়ারীর ঘোড়া ও উট দৌড়াতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং সুচারুরূপে পথ চল। কোন দুর্বল ব্যক্তিকে পিষ্ট করো না এবং মুসলমানকে কষ্ট দিয়ো না।

মুযদালেফায় পৌঁছে গোসল করবে। মুযদালেফা হরমের অন্তর্ভুক্ত। তাই গোসল করে এখানে প্রবেশ করবে। পায়ে হেঁটে প্রবেশ করলে অধিক উত্তম এবং হরমের সম্মানের উপযোগী। পথিমধ্যে সজোরে লাব্বায়ক বলতে থাকবে। মুযদালেফায় পৌঁছে এই দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذِهٖ مُزْدَلِفَةً جُمِعَتْ فِيْهَا السُّنَّةُ مُخْتَلِفَةً نَسْئَلُكَ حَوَائِجَ مُؤْتَنِفَةً فَاجْعَلْنِىْ مِمَّنْ دَعَاكَ فَاسْتَجَبْتَ لَهٗ وَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَكَفَيْتَهٗ ـ

হে আল্লাহ! এটা মুযদালেফা। এতে বিভিন্ন সুন্নতের সমাবেশ হয়েছে। আমরা তোমার কাছে নতুনভাবে প্রার্থনা করছি। অতএব তুমি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর, যাদের দোয়া তুমি কবুল কর এবং যারা তোমার উপর ভরসা করলে তুমি তাদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাও।

অতঃপর মুযদালেফায় এশার সময়ে মাগরিব এবং এশা এক আযান ও দু'তকবীরসহ একত্রে পড়বে। এশার নামায কসর পড়বে। উভয় ফরযের মাঝখানে কোন নফল পড়বে না। কিন্তু উভয় ফরযের পরে মাগরিব ও এশার নফল এবং বেতের পড়ে নেবে। প্রথমে মাগরিবের ও পরে এশার নফল পড়বে। এর পর এ রাত্রি মুযদালেফায় কাটাবে। এ রাত্রিটি হজ্জের করণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। কেউ অর্ধ রাত্রির পূর্বে সেখান থেকে চলে গেলে তাকে 'দম' তথা কোরবানী করতে হবে। দরূদ ও ওযিফার মধ্য দিয়ে এ রাত্রি অতিবাহিত করা উত্তম, সওয়াবের কাজ। রাত্রির অর্ধেক অতিবাহিত হয়ে গেলে সেখান থেকে প্রস্থানের প্রস্তুতি নেবে। এখানে নুড়ি পাথর পাওয়া যায়। তাই জামরার জন্যে এখান থেকে সত্তরটি কংকর কুড়িয়ে নেবে। পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা হেতু বেশী নিলেও ক্ষতি নেই। কংকর হালকা হওয়া চাই, যাতে অঙ্গুলির ডগায় আসে। এর পর অন্ধকারের মধ্যে ফজরের নামায পড়বে এবং রওয়ানা হয়ে যাবে। মুযদালেফার শেষ সীমা মাশ'আরে হারামে পৌঁছে থেমে যাবে এবং চার দিক ফর্সা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত দোয়ায় মশগুল থাকবে। বলবে–

اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالشَّهْرِ

اَلْحَرَامِ وَالرُّكْنِ وَالْمَقَامِ اَبْلِغْ رُوْحَ مُحَمَّدٍ مِنَّا التَّحِيَّةَ وَالسَّلَامَ وَاَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! মাশআরে হারাম, খানায়ে কাবা, সম্মানিত মাস, রোকন ও মকামের ওসিলায় মুহাম্মদ (সঃ)-এর রূহের প্রতি আমাদের সালাম ও অভিবাদন পৌঁছে দাও এবং আমাদেরকে শান্তির গৃহে দাখিল কর, হে প্রতাপান্বিত ও সম্মানিত।

অতঃপর সেখান থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বে দ্রুত সওয়ারী চালিয়ে রওয়ানা হয়ে যাবে 'ওয়াদিয়ে মুহাসসার' নামক স্থানে পৌঁছে দ্রুত সওয়ারী চালিয়ে ময়দান অতিক্রম করে যাবে। পদব্রজে গেলে দ্রুত হেঁটে যাবে। ১০ই যিলহজ্জের ভোর হয়ে গেলে কখনও লাব্বায়কা বলবে এবং কখনও তকবীর বলবে। এভাবে মিনায় পৌঁছবে। এখানে জামরা সামনে পড়বে। জামরা সংখ্যায় তিনটি। প্রথম ও দ্বিতীয় জামরা এমনিতেই অতিক্রম করে যাবে। দশ তারিখে এগুলোতে কোন কাজ করতে হয় না। যখন তৃতীয় জামরা আকাবায় পৌঁছবে এবং সূর্য এক বর্শা পরিমাণ উপরে উঠে যাবে, তখন এই জামরায় কংকর নিক্ষেপ করবে। এ জামরাটি কেবলামুখী ব্যক্তির ডান দিকে পাহাড়ের নীচে অবস্থিত। কংকর মারার স্থানটি একটু উঁচুতে। কংকর মারার নিয়ম হচ্ছে, কেবলার দিকে অথবা জামরার দিকে মুখ করে দাঁড়াবে, অতঃপর হাত তুলে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবে। এ সময় লাব্বায়কার পরিবর্তে তকবীর বলবে। প্রত্যেক কংকরের সাথে এই দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ عَلٰى طَاعَةِ الرَّحْمٰنِ وَرَغْمِ الشَّيْطٰنِ اَللّٰهُمَّ تَصْدِيْقَ بِكِتَابِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ـ

অর্থাৎ, "আল্লাহ মহান। আমি আল্লাহর আনুগত্য করার এবং শয়তানকে লাঞ্ছিত করার জন্যে কংকর নিক্ষেপ করছি। হে আল্লাহ! তোমার কিতাবকে সত্য জ্ঞান করার জন্যে এবং তোমার নবীর সুন্নত অনুসরণ করার জন্যে কংকর নিক্ষেপ করেছি।"

কংকর নিক্ষেপ শেষ হলে লাব্বায়কা ও তকবীর উভয়টি বন্ধ করে দেবে। কিন্তু ফরয নামাযের পর নয় তারিখের যোহর থেকে তের

তারিখের আসরের পর পর্যন্ত তকবীর বলা অব্যাহত রাখবে। নামাযের পরে তকবীর এভাবে পড়বে–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنُ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ صَدَقَ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

এদিন দোয়ার জন্যে জামরার কাছে অবস্থান করবে না; বরং আপন বাসস্থানে গিয়ে দোয়া করবে। অতঃপর সঙ্গে কোরবানীর জীব থাকলে তা যবেহ করবে। নিজ হাতে যবেহ করা উত্তম। যবেহ করার সময় এই দোয়া পড়বে–

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَبِكَ وَاِلَيْكَ تَقَبَّلْ مِنِّىْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِيْلِكَ اِبْرَاهِيْمَ ـ

অর্থাৎ, "আল্লাহর নামে শুরু। আল্লাহ মহান। হে আল্লাহ! এ কোরবানী তোমার পক্ষ থেকে আদায় হয়েছে, তোমারই কারণে আদায় হয়েছে এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। আমার পক্ষ থেকে এটা কবুল কর, যেমন তুমি তোমার খলীল ইবরাহীম (আঃ)-এর পক্ষ থেকে কবুল করেছিলে।"

উট কোরবানী করা উত্তম, এর পর গরু, এর পর ছাগল। ছাগলের তুলনায় দুম্বা কোরবানী করা উত্তম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন– الاضحية الكبش الاقرن উত্তম কোরবানী শিংবিশিষ্ট দুম্বা। সাদা রং লালিমা মিশ্রিত কাল ও কাল রঙের চেয়ে উত্তম। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন– একটি সাদা দুম্বা কোরবানীর বেলায় দু'টি কাল দুম্বার চেয়ে উত্তম। নফল কোরবানী হলে তা থেকে খাবে। দোষযুক্ত জীব কোরবানী করবে না। যেসব দোষের কারণে কোরবানী হয় না, সেগুলো এই ঃ

ল্যাংড়া হওয়া, নাক অথবা কান কর্তিত হওয়া, কান উপরে অথবা নীচে বিদীর্ণ হওয়া, শিং ভাঙ্গা হওয়া, সামনের পা খাটো হওয়া, অত্যধিক জীর্ণশীর্ণ হওয়া। কোরবানীর পরে কেশ মুণ্ডন করবে। কেশ মুণ্ডনের সময় এই দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اَثْبِتْ لِىْ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةً وَامْحُ عَنِّىْ بِهَا سَيِّئَةً وَارْفَعْ لِىْ بِهَا عِنْدَكَ دَرَجَةً ۔

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! আমার জন্যে এটির প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে একটি নেকী রাখ, প্রত্যেক চুলের বদলে একটি গোনাহ্ মিটিয়ে দাও এবং প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে তোমার কাছে আমার একটি মর্তবা বাড়িয়ে দাও।"

নারী তার কেশ সামান্য ছোট করবে। টেকো ব্যক্তির জন্যে মাথায় খুর ফিরিয়ে দেয়া মোস্তাহাব। কেশ মুণ্ডনের সাথে সাথে এহরাম খতম হয়ে যায়। নারী সম্ভোগ ও শিকার ব্যতীত অন্যন্য সকল নিষিদ্ধ কাজ এর পর হালাল হয়ে যায়। এখন মক্কায় গিয়ে তওয়াফ করবে। এ তওয়াফ হজ্জের রোকন। একে তওয়াফে যিয়ারতও বলা হয়। এর সময় দশ তারিখের অর্ধ রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে শুরু হয়। শেষ ওয়াক্তের কোন সীমা নেই। যতক্ষণ ইচ্ছা বিলম্বে এ তওয়াফ করা যায়। কিন্তু তওয়াফ না করা পর্যন্ত এহরামের কিছু প্রভাব বাকী থাকবে। অর্থাৎ, নারী সম্ভোগ করতে পারবে না। তওয়াফে যিয়ারত করে নেয়ার পর নারী সম্ভোগ করতে পারবে এবং পুরোপুরি হালাল হয়ে যাবে। এর পর বাকী থাকে কেবল আইয়ামে তশরীকে জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা এবং মিনায় রাত্রি অতিবাহিত করা। এ দু'টি কাজ এহরাম খতম হওয়ার পরে হজ্জের অনুসরণে ওয়াজিব। তওয়াফে যিয়ারত দু'রাকআত নামাযসহ। তওয়াফে কুদুমের পর যদি সাফা মারওয়ার সায়ী না করে থাকে, তবে এখন তওয়াফে যিয়ারতের পর পূর্বোল্লিখিত নিয়মে সায়ী করে নেবে। পূর্বে সায়ী করে থাকলে সেটাই রোকন হয়ে যাবে। দ্বিতীয় বার করতে হবে না। এহরাম থেকে হালাল হওয়ার উপায় তিনটি ঃ কংকর নিক্ষেপ করা, মাথা মুণ্ডন করা ও তওয়াফে যিয়ারত করা। যবেহসহ এ তিনটিকে আগে পাছে করায় কোন দোষ নেই। কিন্তু প্রথমে কংকর নিক্ষেপ করা

উত্তম, এর পর যবেহ করা, এর পর মাথা মুণ্ডন করা এবং অবশেষে তওয়াফে যিয়ারত করা।

ইমামের জন্যে সূর্য ঢলে পড়ার পর দশ তারিখে খোতবা পাঠ করা সুন্নত। এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিদায়ী খোতবা ছিল। হজ্জে মোট চারটি খোতবা আছে– একটি সাত তারিখে, একটি নয় তারিখে, একটি দশ তারিখে এবং একটি মিনা থেকে প্রথম বিদায়ের দিন অর্থাৎ বার তারিখে। এ চারটি খোতবাই দ্বিপ্রহরে সূর্য ঢলে পড়ার পর। নয় তারিখে আরাফার খোতবা দু'টি। বাকীগুলো এক এক খোতবা। দু'খোতবার মাঝখানে কিছু বসতে হবে।

তওয়াফে যিয়ারত শেষ করার পর রাতের বেলায় থাকা এবং কংকর মারার জন্যে মিনায় ফিরে আসবে। এগার তারিখে যখন সূর্য ঢলে পড়ে তখন কংকর মারার জন্যে গোসল করবে এবং প্রথম জামরার দিকে রওয়ানা হবে। এটা আরাফাতের দিক থেকে প্রথমে ঠিক সড়কের উপর অবস্থিত। সেখানে সাতটি কংকর মারবে। অতঃপর সামনে অগ্রসর হয়ে রাস্তা থেকে সামান্য আলাদা হয়ে কেবলার দিকে মুখ করে দাঁড়াবে এবং আল্লাহ তাআলার হামদ ও তকবীর পাঠ করে অন্তরের উপস্থিতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনয় সহকারে ততক্ষণ দোয়া করবে যতক্ষণ সময় সূরা বাকারা পাঠ করতে লাগে। এর পর দ্বিতীয় জামরার দিকে অগ্রসর হবে। সেখানেও প্রথম জামরার অনুরূপ কংকর নিক্ষেপ করবে। এর পর সামনে অগ্রসর হয়ে জামরা আকাবাতেও সাতটি কংকর মারবে। এর পর কোন কাজ না করে আপন বাসস্থানে এসে রাত কাটাবে। পরদিন অর্থাৎ, বার তারিখের যোহরের নামায বাদে একুশটি কংকর আগের দিনের মত তিনটি জামরায় মারবে। এর পর ইচ্ছা করলে মিনায় অবস্থান করবে এবং ইচ্ছা করলে মক্কায় ফিরে আসবে। সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করলে ভালো। আর যদি রাত্রি পর্যন্ত মিনা ত্যাগ না করে, তবে তার জন্যে বাইরে যাওয়া জায়েয নয়; বরং রাত্রে মিনায় অবস্থান করে তের তারিখে পূর্বের ন্যায় একুশটি কংকর মারতে হবে। রাত্রে না থাকলে এবং কংকর নিক্ষেপ করলে কোরবানী করতে হবে। এ কোরবানীর গোশ্ত সদকা করে দেবে। মিনায় অবস্থানের রাত্রিগুলোতে কাবা গৃহের যিয়ারত করা জায়েয। তবে রাত্রে মিনাতেই থাকতে হবে। মিনায় থাকাকালে ফরয

নামাযসমূহ ইমামের পেছনে মসজিদে খায়ফে পড়বে। এর অনেক সওয়াব। মিনা থেকে মক্কায় যাওয়ার পথে মুহাস্‌সারে বিরতি দেয়া উত্তম। আসর, মাগরিব ও এশার নামায সেখানে পড়বে এবং সামান্য নিদ্রা যাবে। এটা সুন্নত। অনেক সাহাবী থেকে এ সুন্নত বর্ণিত আছে। এটা করলে কোন কাফফারা দিতে হবে না।

ওমরা ও তার পরবর্তী করণীয়

যেব্যক্তি হজ্জের আগে অথবা পরে ওমরা করতে চায়, তার উচিত গোসল করে ওমরার কাপড় পরিধান করা এবং ওমরার মীকাত থেকে এহরাম বাঁধা। তার জন্যে উত্তম মীকাত হচ্ছে জেয়েররানা। এটা মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী এক জায়গার নাম, এর পরে তানয়ীম ও এর পরে হুদায়বিয়া। এহরাম করার সময় ওমরার নিয়ত করে লাব্বায়কা বলবে এবং মসজিদে আয়েশায় গিয়ে দু'রাকআত নামায পড়বে। এখানে যা মনে চায় দোয়া করবে। এর পর লাব্বায়কা বলতে বলতে মক্কায় আসবে এবং মসজিদে হারামের অভ্যন্তরে ঢুকে লাব্বায়কা বলা বন্ধ করবে। অতঃপর সাত চক্কর তওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাত বার সায়ী করবে। সায়ী শেষে মাথা মুণ্ডন করবে। এখন ওমরা পূর্ণ হয়ে গেল। যেব্যক্তি মক্কায় অবস্থান করে, তার উচিত ওমরা ও তওয়াফ বেশী করে করা এবং কাবা গৃহের পানে বেশী পরিমাণে তাকানো। কাবা গৃহের অভ্যন্তরে নগ্নপদে গাম্ভীর্য সহকারে প্রবেশ করবে। যমযম কূপের পানি অধিক পরিমাণে পান করবে। সম্ভব হলে অন্যের সাহায্য না নিয়ে নিজ হাতে পানি তুলে পান করবে। এত বেশী পান করবে যেন উদর ভর্তি হয়ে যায়। এ সময় এই দোয়া পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ شِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ وَّسَقَمٍ وَّارْزُقْنِى الْاِخْلَاصَ وَالْيَقِيْنَ وَالْمُعَافَاةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ۔

হে আল্লাহ! এ পানিকে প্রত্যেক অসুখ বিসুখের প্রতিষেধক কর এবং আমাকে আন্তরিকতা, বিশ্বাস ও দুনিয়া আখেরাতের নিরাপত্তা নসীব কর। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন–

ماء زمزم لما شرب له অর্থাৎ, যমযমের পানি যে মকসূদে পান করা হয়, তা হাসিল হয়। তাই দোয়া করা উচিত।

বিদায়ী তওয়াফ

হজ্জ ও ওমরার পর যখন দেশে ফিরতে মনে চায়, তখন সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে কা'বা থেকে বিদায় নেবে। এই বিদায় নেয়ার নিয়ম হচ্ছে, পূর্ববর্ণিত পন্থায় সাত চক্করের তওয়াফ করবে। এতে রমল ও এস্তেবাগ করবে না। তওয়াফ শেষে মকামে ইবরাহীমের পেছনে দু'রাকআত নামায পড়বে এবং যমযমের পানি পান করে মুলতাযামে আসবে। অতঃপর দোয়া ও কাকুতি মিনতি করবে। বলবে–

"হে আল্লাহ! নিশ্চয় এ গৃহ তোমার গৃহ, এ বান্দা তোমার বান্দা– তোমার গোলামের ও তোমার বাঁদীর পুত্র। আমার জন্য নিয়োজিত বস্তুতে তুমি আমাকে সওয়ার করিয়েছ, তোমার শহরসমূহ পরিভ্রমণ করিয়েছ এবং আপন নেয়ামত আমাকে পৌছিয়েছ, এমনকি হজ্জের ক্রিয়াকর্ম আদায় করতে আমাকে সাহায্য করেছ। সুতরাং আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকলে তুমি আমাকে আরও বেশী সন্তুষ্টি দাও। নতুবা এখন তোমার গৃহ থেকে দূরে যাওয়ার পূর্বে আমার প্রতি অনুগ্রহ কর। এটা আমার দেশে ফেরার সময়, যদি তুমি অনুমতি দাও– এমতাবস্থায় যে, আমি যেন তোমার বদলে অন্য কাউকে অবলম্বন না করি, তোমার গৃহের পরিবর্তে অন্য গৃহ পছন্দ না করি, যেন তোমার প্রতি বিরূপ এবং তোমার গৃহের প্রতি অসন্তুষ্ট না হই। হে আল্লাহ! দৈহিক সুস্থতা ও ধর্মীয় হেফাযতকে আমার সঙ্গী কর। আমার প্রত্যাবর্তন সুন্দর কর। জীবিত থাকা পর্যন্ত আমাকে তোমার আনুগত্য দান কর। আমার জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ একত্রিত কর। তুমি সবকিছু করার ক্ষমতা রাখ। হে আল্লাহ! একে তোমার গৃহে আমার সর্বশেষ উপস্থিতি করো না। যদি সর্বশেষ উপস্থিতি কর, তবে এর বিনিময়ে আমাকে জান্নাত দান কর।"

এর পর দৃষ্টির আড়ালে চলে যাওয়া পর্যন্ত কা'বা গৃহ থেকে চক্ষু না ফেরানো উত্তম।

মদীনার যিয়ারত ও তার আদব

রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন–

من زارني بعد وفاتي فكانما زارني في حياتي ـ

যেব্যক্তি আমার ওফাতের পরে আমার যিয়ারত করে, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করে।

তিনি আরও বলেন–

من وجد سعته ولم يفد الى فقد جفاني ـ

যেব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমার কাছে না আসে, সে আমার প্রতি জুলুম করে।

আরও বলেন–

من جاء ني زائرا لايهمه الا زيارتي كان حقا على الله سبحنه ان اكون له شفيعا ـ

যেব্যক্তি যিয়ারতের উদ্দেশে আগমন করে এবং আমার যিয়ারত ছাড়া তার অন্য কোন চিন্তা না থাকে, আল্লাহর যিম্মায় তার হক হয়ে যায় যে, আমি তার সুপারিশকারী হই।

সুতরাং যেব্যক্তি মদীনার যিয়ারত করার ইচ্ছা করে, তার পথিমধ্যে বেশী করে দরূদ পাঠ করা উচিত। মদীনার প্রাচীর ও বৃক্ষসমূহের উপর দৃষ্টি পতিত হলে সে বলবে–

اَللّٰهُمَّ هٰذَا حَرَمُ رَسُوْلِكَ فَاجْعَلْهُ لِىْ وِقَايَةً مِنَ النَّارِ وَاَمَانًا مِنَ الْعَذَابِ وَسُوْءِ الْحِسَابِ ـ

হে আল্লাহ! এটা তোমার রসূলের হরম। অতএব তুমি একে আমার জন্যে দোযখ থেকে আত্মরক্ষার উপায় ও মন্দ হিসাব-নিকাশ থেকে মুক্তির কারণ করে দাও।

অতঃপর প্রস্তরময় ভূমিতে গোসল করবে; সুগন্ধি লাগাবে এবং

নিজের উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করবে। এর পর বিনয় ও তাযীম সহকারে মদীনায় প্রবেশ করবে এবং এই দোয়া পড়বে–

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ـ

শুরু আল্লাহর নামে এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ধর্মের নিয়মে। পরওয়ারদেগার, আমাকে সত্যের উপর দাখিল কর, সত্যের উপর বের কর এবং আমার জন্যে তোমার পক্ষ থেকে সাহায্য বরাদ্দ কর।

অতঃপর মসজিদের উদ্দেশে রওয়ানা হবে। মসজিদের অভ্যন্তরে গিয়ে মিম্বরের কাছে এভাবে দু'রাকআত নামায পড়বে যেন মিম্বরের স্তম্ভ ডান কাঁধের বরাবর থাকে, মুখ সেই স্তম্ভের দিকে থাকবে, যার বরাবরে সিন্দুক রাখা আছে এবং মসজিদের কেবলায় অবস্থিত বৃত্তটি চোখের সামনে থাকবে। এ স্থানটি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দাঁড়ানোর জায়গা ছিল। ইদানীং মসজিদের যদিও পরিবর্তন হয়েছে, তথাপি চেষ্টা করবে যাতে পরিবর্তনের পূর্বেকার আসল মসজিদে নামায পড়া যায়। এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রওযা মোবারকে যাবে এবং তাঁর মুখমণ্ডলের বামে এমনভাবে দাঁড়াবে যে, পিঠ কা'বার দিকে এবং মুখ রওযা মোবারকের প্রাচীরের দিকে থাকবে। সেই প্রচীরের কোণের স্তম্ভ থেকে চার হাত দূরে দাঁড়াবে। প্রাচীরে হাত লাগানো অথবা চুম্বন করা সুন্নত নয়; বরং তাযীম সহকারে দূরে দাঁড়ানো অধিকতর সমীচীন। দাঁড়িয়ে বলবে ঃ সালাম তোমার প্রতি হে আল্লাহর রসূল। সালাম তোমার প্রতি হে আল্লাহর নবী! সালাম তোমার প্রতি হে আল্লাহর বিশ্বস্ত! সালাম তোমার প্রতি হে আল্লাহর হাবীব। সালাম তোমার প্রতি হে আল্লাহর মনোনীত। সালাম তোমার প্রতি হে আল্লাহর পছন্দনীয়। সালাম তোমার প্রতি হে আহমদ। সালাম তোমার প্রতি হে মুহাম্মদ। সালাম তোমার প্রতি হে আবুল কাসেম। সালাম তোমার প্রতি হে কুফর বিলুপ্তকারী। সালাম তোমার প্রতি হে পেছনে আগমনকারী। সালাম তোমার প্রতি হে সতর্ককারী। সালাম তোমার প্রতি হে পবিত্রতম। সালাম তোমার প্রতি হে পবিত্র। সালাম তোমার প্রতি হে আদম সন্তানের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত। সালাম তোমার প্রতি হে রসূলগণের সর্দার। সালাম তোমার প্রতি হে সর্বশেষ

নবী। সালাম তোমার প্রতি হে বিশ্ব পালনকর্তার রসূল। সালাম তোমার প্রতি হে কল্যাণের নেতা। সালাম তোমার প্রতি হে পুণ্য উদঘাটনকারী। সালাম তোমার প্রতি হে রহমতের নবী। সালাম তোমার প্রতি হে উম্মতের পথপ্রদর্শক। সালাম তোমার প্রতি হে উজ্জ্বল হাত পা বিশিষ্ট মুমিনদের নেতা। সালাম তোমার প্রতি এবং তোমার পরিবারবর্গের প্রতি, যাঁদের থেকে আল্লাহ নাপাকী দূর করেছেন এবং যাঁদেরকে পবিত্র করেছেন। সালাম তোমার প্রতি এবং তোমার পূত পবিত্র সহচরগণের প্রতি এবং তোমার পবিত্রাত্মা সহধর্মিণীগণের প্রতি, যাঁরা মুমিনগণের জননী। আল্লাহ তোমাকে আমাদের পক্ষ থেকে এমন প্রতিদান দিন যা সেই প্রতিদান থেকে উত্তম, যা কোন নবীকে তাঁর কওমের পক্ষ থেকে এবং কোন রসূলকে তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত নাযিল করুন। যখনই স্মরণকারীরা তোমাকে স্মরণ করে এবং যখনই উদাসীনরা তোমা থেকে উদাসীন হয়। অগ্রগামীদের ও পশ্চাদগামীদের প্রতি। আল্লাহ আমাদেরকে তোমার মাধ্যমে গোমরাহী থেকে বাঁচিয়েছেন। তোমার মাধ্যমে আমাদেরকে অন্ধত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং মূর্খতা থেকে জ্ঞানের পথে এনেছেন। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে, তুমি তাঁর বান্দা, রসূল, বিশ্বস্ত, মনোনীত, সৃষ্টির মধ্যে পছন্দনীয়। আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমি আল্লাহর পয়গাম পৌঁছিয়েছ, আমানত যথার্থরূপে আদায় করেছ, উম্মতকে উপদেশ দিয়েছ, শত্রুর সাথে জেহাদ করেছ, উম্মতকে সৎপথে পরিচালিত করেছ এবং আমরণ আপন প্রভুর এবাদত করেছ। অতএব রহমত নাযিল করুন আল্লাহ তোমার প্রতি, তোমার পবিত্র পরিবারবর্গের প্রতি, শান্তিবর্ষণ করুন, গৌরব, সম্মান ও মাহাত্ম্য দান করুন।

যদি কেউ তার সালাম পৌঁছানোর কথা বলে থাকে, তবে বলবে– اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ فُلَانٍ অমুকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি সালাম।

অতঃপর এক হাত পরিমাণ সরে এসে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর প্রতি সালাম পড়বে। কেননা, তাঁর মাথা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাঁধের কাছে রয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর মাথা হযরত আবু বকরের কাঁধের কাছে রয়েছে। তাই আরও এক হাত সরে এসে তাঁকেও সালাম

বলবে এবং এই দোয়া পাঠ করবে–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا وَزِيْرَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُعَاوِنِيْنَ لَهٗ عَلَى الْقِيَامِ بِالدِّيْنِ مَادَامَ حَيًّا وَالْقَائِمِيْنَ فِىْ فَجَزَاكُمَا اللّٰهُ خَيْرَ مَاجُزِىَ وَزِيْرَىْ نَبِيٍّ عَنْ دِيْنِهٖ -

"তোমাদের প্রতি সালাম হে রসূলুল্লাহর উযীরদ্বয়, তাঁর জীবদ্দশা পর্যন্ত ধর্মের কাজে তাঁর সাহায্যকারীদ্বয় এবং তাঁর পরে উম্মতের মধ্যে ধর্মীয় কাজের ব্যবস্থাপকদ্বয়। তোমরা এক্ষেত্রে তাঁর হাদীস অনুসরণ করেছ এবং তাঁর সুন্নত মেনে চলেছ। অতএব তোমাদেরকে আল্লাহ এমন প্রতিদান দিন, যা সেই প্রতিদান থেকে উত্তম, যা কোন নবীর উযীরদ্বয়কে তাঁর ধর্মের পক্ষ থেকে দিয়েছেন।"

এর পর সরে গিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মাথার কাছে কবর ও ইদানীং নির্মিত স্তম্ভের মাঝখানে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে এবং আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করবে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে এবং বলবে ঃ ইলাহী, তুমি বলেছ এবং তোমার কথা সত্য–

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا -

"যদি তারা নিজেদের উপর জুলুম করার পর তোমার কাছে আসে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রসূলও তাদের জন্যে ক্ষমা চায়, তবে তারা আল্লাহকে তওবা কবুলকারী দয়ালু পাবে।"

ইলাহী, আমরা তোমার এরশাদ শুনেছি, তোমার আদেশ পালন করে তোমার রসূলের কাছে এসেছি এবং তাঁকে তোমার দরবারে আমাদের অজস্র গোনাহের ব্যাপারে সুপারিশকারী করেছি। আমরা গোনাহ্ থেকে তওবা করছি এবং নিজেদের ভুলত্রুটি স্বীকার করছি। ইলাহী, আমাদের তওবা কবুল কর, নবী করীম (সাঃ)-এর সুপারিশ আমাদের ব্যাপারে

মঞ্জুর কর এবং তোমার কাছে তাঁর মর্যাদার দৌলতে আমাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান কর।

এর পর বলবে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَاغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لَاتَجْعَلْهُ اٰخِرَ الْعَهْدِ مِنْ قَبْرِ نَبِيِّكَ وَمِنْ حَرَمِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

হে আল্লাহ! মুহাজির ও আনসারগণকে ক্ষমা কর এবং ক্ষমা কর আমাদেরকে এবং আমাদের সেই ভাইদেরকে, যারা আমাদের পূর্বে ঈমানের সাথে দুনিয়া থেকে চলে গেছে। হে আল্লাহ! একে তোমার নবীর কবরে এবং তোমার হরমে আমার শেষ উপস্থিতি করো না হে পরম দয়ালু।

এর পর কবর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানে গিয়ে দু'রাকআত নামায পড়বে এবং অনেক দোয়া করবে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন–

"আমার কবর ও মিম্বরের মধ্যস্থলে বেহেশতের একটি বাগান রয়েছে। আর আমার মিম্বর হাউজে কাওসারের উপর অবস্থিত।" সুতরাং মিম্বরের কাছে দোয়া করবে। মিম্বরের নীচের স্তরে হাত রাখা মোস্তাহাব। বৃহস্পতিবার দিন ওহুদ পাহাড়ে যাওয়া এবং শহীদগণের কবর যিয়ারত করা মোস্তাহাব। অর্থাৎ ফজরের নামায মসজিদে নববীতে পড়ে যিয়ারত করতে যাবে এবং ফিরে এসে যোহরের নামায মসজিদে নববীতে পড়বে। এতে কোন ফরয নামায মসজিদের জামাআত থেকে ফওত হবে না। আরও মোস্তাহাব এই যে, প্রত্যহ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করার পর জান্নাতুল বাকী গোরস্থানে যাবে এবং হযরত ওসমান গনী, হযরত হাসান (রাঃ), হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন, ইমাম বাকের ও ইমাম জা'ফর সাদেকের কবর যিয়ারত করবে এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর মসজিদে নামায পড়বে। এছাড়া হযরত ইবরাহীম ইবনে রসূলুল্লাহ (সাঃ), হযরত সফিয়্যা প্রমুখের কবরও যিয়ারত করবে। তাঁরা জান্নাতুল বাকীতেই সমাহিত রয়েছেন।

প্রত্যেক শনিবারে মসজিদে কোবায় গিয়ে নামায পড়াও মোস্তাহাব।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন– যে কেউ বাড়ী থেকে বের হয়ে মসজিদে কোবায় এসে নামায পড়ে, তার জন্যে এক ওমরার সমান সওয়াব রয়েছে। মসজিদে কোবা সংলগ্ন আরিস কূপের যিয়ারত করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এতে থুথু মোবারক নিক্ষেপ করেছিলেন। এমনিভাবে আরও মসজিদসমূহের যিয়ারত করবে। কথিত আছে, মদীনায় মসজিদ ও যিয়ারতের স্থান সর্বমোট ত্রিশটি। যতদূর সম্ভব এগুলোতে যাওয়ার চেষ্টা করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেসব কূপে ওযু করতেন, সেগুলোতে যাবে এবং রোগমুক্তির জন্যে তাবাররুক মনে করে সেগুলোর পানি দিয়ে গোসল করবে এবং পান করবে। এরূপ কূপ সাতটি।

যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে মদীনায় বসবাস করতে পারলে তার সওয়াব অনেক বেশী। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

لا يصبر على لاوائها وشدتها احد الا كنت له شفيعا يوم القيامة ـ

"যেব্যক্তি মদীনার কষ্ট সহ্য করে সেখানে বসবাস করে, আমি কেয়ামতের দিন তার জন্যে সুপারিশকারী হব।"

তিনি আরও বলেন–

من استطاع ان يموت بالمدينة فليمت فانه لن يموت بها احد الا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة

"যে মদীনায় মরতে সক্ষম হয়, সে যেন মদীনাতে মরে। কেননা, যে কেউ মদীনায় মৃত্যুবরণ করবে, আমি তার জন্যে কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী অথবা সাক্ষ্যদানকারী হব।।"

কাজ শেষে মদীনা ত্যাগ করার ইচ্ছা করলে মোস্তাহাব হচ্ছে, রওযা মোবারকে পুনরায় আসবে এবং পূর্বোল্লিখিত যিয়ারতের দোয়া পাঠ করবে। অতঃপর রসূলে খোদা (সাঃ)-এর কাছ থেকে বিদায় নেবে এবং পুনরায় যিয়ারতে হাযির হওয়ার তওফীক দানের জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে। এর পর ছোট রওযায় দু'রাকআত নামায পড়বে। এটা মসজিদের ভিতরকার সেই স্থান, যেখানে রসূলুল্লাহ (সাঃ) দাঁড়াতেন।

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে বাম পা, পরে ডান পা বাইরে রাখবে এবং এই দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّلَا تَجْعَلْهُ اٰخِرَ الْعَهْدِ بِبَيْتِكَ وَحُطَّ اَوْزَارِىْ بِزِيَارَتِهٖ وَاصْحَبْنِىْ فِىْ سَفَرِى السَّلَامَةَ وَيَسِّرْ رُجُوْعِىْ اِلٰى اَهْلِىْ وَوَطَنِىْ سَالِمًا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

"হে আল্লাহ! মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি রহমত নাযিল কর। একে তোমার গৃহে আমার শেষ উপস্থিতি করো না। এর যিয়ারত দ্বারা আমার পাপের বোঝা নামিয়ে দাও। সফরে নিরাপত্তাকে আমার সঙ্গী কর এবং আমার নিরাপদে দেশে ফেরা সহজ কর হে পরম দয়ালু।"

সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সুন্নত

রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন কোন জেহাদ অথবা হজ্জ ইত্যাদি থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন উচ্চ ভূমিতে তিন বার আল্লাহু আকবর বলতেন এবং এই দোয়া পাঠ করতেন–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ رَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ ـ

অর্থাৎ, আমরা ফিরে এসেছি আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, এবাদতকারী, সেজদাকারী ও প্রভুর প্রশংসাকারী হয়ে। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা সত্য করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং শত্রু বাহিনীকে একা পরাস্ত করেছেন।

কোন কোন রেওয়ায়েতে এ শব্দও বর্ণিত আছে–

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস হবে। রাজত্ব তাঁরই। তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। সফর থেকে ফেরার সময় এই সুন্নত পালন করা উচিত।

আপন বসতি এলাকা দৃষ্টিগোচর হলে সওয়ারী দ্রুত চালাবে এবং এই দোয়া পড়বে– اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَنَا بِهَا قَرَارًا وَّرِزْقًا হে আল্লাহ! আমাদের জন্যে এতে স্থিতি ও উত্তম রিযিক নসীব কর।

এর পর গৃহে খবর পৌঁছানোর জন্যে কাউকে পাঠাবে। কেননা, পূর্বাহ্নে ফিরে আসার সংবাদ দেয়া সুন্নত। রাতের বেলায় গৃহে আসা ঠিক নয়। শহরে প্রবেশ করে প্রথমে মসজিদে যাবে এবং দু'রাকআত নামায পড়বে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাই করতেন। গৃহে প্রবেশ করে বলবে–

تَوْبًا تَوْبًا لِرَبِّنَا اَوْبًا لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا ـ

আমি তওবাপরওয়ারদেগারের প্রতি সফর থেকে ফেরা অবস্থায়, যাতে তিনি কোন গোনাহ না রাখেন।

বাড়ীতে থাকাকালে আল্লাহ তাআলা বায়তুল্লাহর যিয়ারত ও রওযা মোবারকের যিয়ারতের যে নেয়ামত দান করেছেন, তা বিস্মৃত হবে না এবং এর প্রতি উদাসীন হয়ে ক্রীড়া কৌতুক ও গোনাহে লিপ্ত হয়ে অকৃতজ্ঞ হবে না। কেননা, এটা মকবুল হজ্জের পরিচায়ক নয়। বরং মকবুল হজ্জের আলামত হচ্ছে, হজ্জ থেকে ফিরে এসে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত এবং আখেরাতের প্রতি অধিক আসক্ত হবে এবং গৃহের যিয়ারতের পর গৃহের মালিক আল্লাহর যিয়ারতের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

হজ্জের আভ্যন্তরীণ আদব নিম্নরূপ–

(১) হালাল অর্থ ব্যয় করে হজ্জ করা এবং এমন কোন ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে জড়িত না হওয়া, যদ্দারা মনোযোগ বিভক্ত হয়ে পড়ে; বরং মনোযোগ বিশেষভাবে কেবল আল্লাহর যিকির ও তাঁর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে নিবিষ্ট হওয়া। এক হাদীসে বর্ণিত আছে– শেষ যমানায় মানুষ চার ভাগে বিভক্ত হয়ে হজ্জ করতে বের হবে। এক, রাজা-বাদশাহ ও শাসনকর্তারা দেশ ভ্রমণ ও তামাশার উদ্দেশে; দুই, ধনী

ব্যক্তিরা ব্যবসার খাতিরে; তিন, ফকীররা ভিক্ষাবৃত্তির জন্যে এবং চার, আলেমরা সুখ্যাতি লাভের আশায় হজ্জে যাবে। এ হাদীসে দুনিয়ার সেসব উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেগুলো হজ্জে অর্জিত হতে পারে। এগুলো হজ্জের ফযীলতের পরিপন্থী। যারা এসব উদ্দেশ্য নিয়ে হজ্জ করে, তারা বিশেষ ব্যক্তিবর্গের তালিকা থেকে বাদ পড়ে; বিশেষতঃ এসব উদ্দেশ্য যদি বিশেষভাবে হজ্জের সাথেই সম্পৃক্ত হয়। উদাহরণতঃ মজুরি নিয়ে অন্যের জন্যে হজ্জ করলে আখেরাতের কাজে দুনিয়া তলব করা হবে। পরহেযগারদের কাছে এটা নিন্দনীয়। হাঁ, যদি কেউ মক্কায় বসবাস করার নিয়ত করে এবং সেখানে পৌঁছার খরচ তার কাছে না থাকে, তবে এ নিয়তে অন্যের কাছ থেকে কিছু নেয়ায় দোষ নেই। মোট কথা, আখেরাতকে দুনিয়া লাভের উপায় করবে না; বরং দুনিয়াকে আখেরাত লাভের উপায় করতে হবে। অন্যের হজ্জ করার বেলায় কাবার যিয়ারত এবং মুসলমান ভাইয়ের ফরয আদায় করার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করার নিয়ত করতে হবে। এ অর্থেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা এক হজ্জের কারণে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে দাখিল করবেন– প্রথম, যে হজ্জের ওসিয়ত করে, দ্বিতীয়, যে হজ্জ জারি করে এবং তৃতীয়, যে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে। আমরা একথা বলি না যে, যেব্যক্তি নিজের হজ্জ করে নিয়েছে, তার জন্যে অপরের হজ্জের মজুরি নেয়া নাজায়েয ও হারাম। বরং আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এরূপ না করা উত্তম। একে পেশা ও ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা আখেরাতের কারণে দুনিয়া দিয়ে দেন; কিন্তু দুনিয়ার কারণে আখেরাত দান করেন না। কিরূপ মজুরি নেয়া জায়েয, তার দৃষ্টান্ত হাদীসে বর্ণিত আছে। যেব্যক্তি আল্লাহর পথে জেহাদ করে এবং মজুরি গ্রহণ করে, সে হযরত মূসা (আঃ)-এর জননীর মত। তিনি আপন শিশুকে দুগ্ধ পান করিয়ে তার মজুরি গ্রহণ করতেন। অতএব যেব্যক্তি হজ্জের বিনিময়ে মজুরি গ্রহণ করার ব্যাপারে মূসা জননীর মত হয়, তার জন্যে মজুরি নেয়ায় কোন দোষ নেই; অর্থাৎ হজ্জ ও বায়তুল্লাহর যিয়ারতে সক্ষম হওয়ার উদ্দেশেই মজুরি নেবে এবং মজুরি পাওয়ার উদ্দেশে হজ্জ করবে না। যেমন মূসা জননীর মজুরি নেয়ার কারণ ছিল আপন শিশুকে দুগ্ধ পান করানো এবং নিজের অবস্থাও মানুষের কাছে গোপন রাখা।

(২) পথিমধ্যে খোদাদ্রোহীদেরকে টাকা পয়সা দেবে না। যারা টাকা-পয়সা নেয়, তারা মক্কার ধনী ও আরব সরদারদের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকে। এরা পথের মধ্যে বসে মানুষকে মসজিদে হারামে যেতে বাধা দেয়। এদেরকে টাকা পয়সা দেয়া জুলুমের কাজে সাহায্য করা এবং জুলুমের উপকরণ সরবরাহ করার নামান্তর। তাই এই অর্থ দেয়া থেকে বেঁচে থাকার জন্যে কোন উপায় অবশ্যই করা উচিত। কোন কোন আলেম বলেন ঃ নফল হজ্জ না করা এবং রাস্তা থেকে ফিরে আসা এই জালেমদেরকে সাহায্য করার চেয়ে উত্তম। এটা একটা নবাবিষ্কৃত বেদআত। এটা মেনে নেয়ার অনিষ্ট হচ্ছে, এতে করে এই জুলুম একটা সাধারণ নিয়মে পরিণত হবে। এটা বহাল থাকার মধ্যে রয়েছে মুসলমানদের অপমান ও লাঞ্ছনা। আলেম ঠিকই বলেছেন। এ টাকা পয়সা জবরদস্তিমূলকভাবে নেয়া হয়। কাজেই এতে দাতার কোন দোষ নেই। একথা বলে কেউ দায়িত্বমুক্ত হতে পারবে না। কেননা, ঘরে বসে থাকলে অথবা রাস্তা থেকে ফিরে এলে কেউ জোর করে টাকা-পয়সা নেবে না। এই জালেমরা যাকে সুখী সচ্ছল দেখে, তার কাছেই বেশী চায়। ফকীরের বেশে দেখলে কেউ চায় না। কাজেই বুঝা গেল, এই অপারগ অবস্থাটা নিজেরই সৃষ্টি করা।

(৩) পাথেয় অধিক পরিমাণে সঙ্গে নেবে। কৃপণতা ও অপব্যয় ছাড়া মাঝারি পন্থায় সানন্দে দান ও ব্যয় করবে। অপব্যয়ের অর্থ আমাদের মতে উৎকৃষ্ট খাদ্য খাওয়া এবং ধনীদের ন্যায় বিলাস-ব্যসনের আসবাবপত্র রাখা। অধিক দান খয়রাতে অপব্যয় হয় না। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ অপব্যয়ে কল্যাণ নেই এবং খয়রাতে অপব্যয় নেই। হজ্জের পথে পাথেয় দান করে দেয়ার মানে আল্লাহর পথে ব্যয় করা, যাতে এক দেরহাম সাতশ' দেরহামের সমান হয়ে থাকে। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ সফরে ভাল পাথেয় রাখাও দানশীলতার অন্তর্ভুক্ত। হাজীদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যার নিয়ত সর্বাধিক খাঁটি, পাথেয় পবিত্র এবং বিশ্বাস ভাল হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة فقيل يا

رسول الله ما بر الحج فقال طيب الكلام واطعام الطعام۔

অর্থাৎ, মকবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া কিছুই নয়। কেউ জিজ্ঞেস করল, মকবুল হজ্জ কি, তিনি বললেন ঃ ভাল কথা বলা এবং আহার করানো।

(৪) হজ্জে গিয়ে অশ্লীলতা, অপকর্ম ও কলহ বিবাদ করা উচিত নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ

অর্থাৎ, রফস, ফুসুক ও জিদাল হজ্জে নেই। রফসের মধ্যে সর্বপ্রকার অনর্থক অশ্লীল কথাবার্তা অন্তর্ভুক্ত। নারীদের সাথে কথাবার্তা বলা, দৌড়াদৌড়ি করা, সঙ্গমের অবস্থা এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদি আলোচনা করাও এর মধ্যে দাখিল। কেননা, এসব বিষয় দ্বারা সহবাসের আগ্রহ জাগে, যা হজ্জে নিষিদ্ধ এবং নিষিদ্ধ কাজের আগ্রহ সৃষ্টিকারী বিষয়ও নিষিদ্ধ। 'ফুসুক' শব্দের অর্থ আল্লাহর আনুগত্যের বাইরে যাওয়া, তা যেভাবেই হোক। জিদাল বলে যে ঝগড়া-বিবাদ পারস্পরিক বিদ্বেষ সৃষ্টি করে তাকে। হযরত সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ যেব্যক্তি হজ্জে নির্লজ্জ কথা বলে, তার হজ্জ কলুষিত হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ভাল কথা বলা এবং আহার করানোকে মকবুল হজ্জ বলেছেন। কথা কাটাকাটি করা ভাল কথার বিপরীত। তাই জরুরী যে, হজ্জের পথে মানুষ তার সঙ্গী, খাদেম প্রমুখের কাজে বেশী আপত্তি করবে না; বরং সকল হাজীর সামনে নত হয়ে থাকবে। সচ্চরিত্রতা নিজের জন্যে অপরিহার্য করে নেবে। অপরকে কষ্ট না দেয়াই কেবল সচ্চরিত্রতা নয়; বরং অপরের দেয়া কষ্ট নীরবে সহ্য করাও সচ্চরিত্রতা। কেউ কেউ বলে ঃ সফরকে সফর বলার কারণ, সফর মানুষের চরিত্র ফুটিয়ে তোল। এ কারণেই এক ব্যক্তি যখন হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে উল্লেখ করল, সে অমুক ব্যক্তিকে চেনে, তখন তিনি বললেন ঃ তুমি কখনও তার সাথে সফরে ছিলে? সে বলল ঃ না, কখনও ছিলাম না। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ তা হলে আমার জানামতে তুমি তাকে চেন না। কেননা সফর দ্বারা মানুষের চারিত্রিক গুণাবলী জানা যায়।

(৫) যদি শক্তি থাকে, তবে পদব্রজে হজ্জ করবে। এটা উত্তম।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে পুত্রদেরকে ওসিয়ত করেন– বৎসগণ! পায়ে হেঁটে হজ্জ করবে। কেননা, যে পায়ে হেঁটে হজ্জ করে, সে প্রতি পদক্ষেপে হরমের নেকীসমূহ থেকে সাতশ' নেকী পায়। কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ হরমের নেকী কি? তিনি বললেন ঃ এক নেকী লাখ নেকীর সমান। হজ্জের ক্রিয়াকর্মে অন্য পথের তুলনায় মক্কা থেকে আরাফাত পর্যন্ত পথ পায়ে হেঁটে চলা অধিক মোস্তাহাব। যদি পাঁয়ে হাঁটার সাথে আপন গৃহ থেকেই এহরামও বেঁধে নেয় তবে কথিত আছে, এটা হচ্ছে হজ্জ পূর্ণ করা, যার আদেশ আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন– وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ অর্থাৎ, হজ্জ ও ওমরাকে আল্লাহর জন্যে পূর্ণ কর। হযরত ওমর, হযরত আলী ও হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) এ আয়াতের তফসীর তাই করেছেন। কোন কোন আলেম বলেন ঃ সওয়ার হওয়া উত্তম। এতে অর্থ ব্যয় হয় এবং মন সংকীর্ণ হয় না। কষ্টও কম হয়। এতে নিরাপত্তা ও হজ্জ পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে দেখলে এ উক্তি প্রথম উক্তির বিপরীত নয়। কাজেই পদব্রজে চলা যার পক্ষে সহজ, তার জন্যে পদব্রজে চলা উত্তম। আর যদি কেউ দুর্বল হয়ে পড়ে অথবা হজ্জের ক্রিয়াকর্মে ত্রুটি দেখা দেয়, তবে তার জন্যে সওয়ার হওয়া উত্তম। জনৈক আলেমকে কেউ প্রশ্ন করল, ওমরার জন্যে পায়ে হেঁটে যাওয়া উত্তম, না এক দেরহাম দিয়ে একটি গাধা ভাড়া করে নেবে? বললেন– যদি এক দেরহাম ব্যয় করা তার কাছে অধিক অপ্রিয় হয়, তবে গাধা ভাড়া করা তার জন্যে পায়ে হেঁটে যাওয়ার তুলনায় উত্তম। আর যদি ধনীদের ন্যায় পায়ে হেঁটে যাওয়া কষ্টকর মনে হয় তবে পায়ে হেঁটে যাওয়া উত্তম। এ জওয়াবে যে দিক অবলম্বন করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে মনের বিরুদ্ধে জেহাদ করা। মোট কথা, এটাও একটা দিক। কিন্তু পায়ে হেঁটে যাওয়াই উত্তম। এমতাবস্থায় সওয়ারীতে যে টাকা ব্যয় হত, তা খয়রাত করে দেবে। আর যদি কারও মন পায়ে হাঁটা ও খয়রাত করার দ্বিগুণ কষ্ট পছন্দ না করে তবে উপরোক্ত আলেম বর্ণিত পন্থাই উত্তম।

(৬) ভগ্নদশা, এলোকেশ ও ধুলাধূসরিত থাকবে– সাজসজ্জা করবে না এবং গর্ব ও ধনাঢ্যতার সামগ্রীর প্রতি প্রবণতা দেখাবে না, যাতে

কোথাও অহংকারী ও আরামপ্রিয়দের তালিকাভুক্ত না হয়ে যায় এবং ফকীর, মিসকীন ও সংকর্মপরায়ণদের কাতার থেকে খারিজ না হয়ে যায়। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক হাদীসে মলিন বদন থাকা ও পায়ে হাঁটার আদেশ করেছেন এবং অলসতা বিলাসিতা করতে নিষেধ করেছেন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– হাজী সে ব্যক্তির যার কেশ এলোমেলো থাকে এবং শরীর থেকে গন্ধ আসে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ আমার গৃহের যিয়ারতকারীদেরকে দেখ, কেমন প্রশস্ত ও গভীর গিরিপথ দিয়ে মলিন বদন ও ধুলাধূসরিত অবস্থায় চলে আসছে। এক আয়াতে আছে– ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ অর্থাৎ, এর পর তারা তাদের ধুলা-ময়লা খতম করুক। تفث শব্দের অর্থ চুল এলোমেলো এবং ধুলাধূসরিত হওয়া। একে খতম করার অর্থ কেশ মুণ্ডন করা, গোঁফ ও নখ কাটা। হযরত ওমর (রাঃ) সেনানায়কদের চিঠি লেখেন যে, পুরাতন বস্ত্র পরিধান কর এবং কঠোরতা সহ্য করার অভ্যাস গড়ে তোল। কেউ বলেন ঃ ইয়ামনবাসীরা হাজীদের সৌন্দর্য। কেননা, তারা বিনম্র, ভগ্নদশা এবং পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের চরিত্রে চরিত্রবান। বিশেষভাবে লাল পোশাকে পরিধান এবং সুখ্যাতির বিষয়াদি থেকে সাধারণত বিরত থাকতে হবে। বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক সফরে ছিলেন। তাঁর সহচরগণ এক মনযিলে নেমে উট চরাতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, উটের গদিতে লাল রংয়ের চাদর পড়ে রয়েছে। তিনি বললেন ঃ আমার মনে হয়, এই লাল রং তোমাদের উপর প্রবল হয়ে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন ঃ একথা শুনে আমরা সকলেই উঠে দাঁড়ালাম এবং চাদরগুলো উটের পিঠ থেকে নামিয়ে দিলাম। ফলে কতক উট পালিয়ে গেল।

(৭) চতুষ্পদ জন্তুর প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করবে এবং সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা সেটির পিঠে চাপাবে না। উটের পিঠে খাট সংযুক্ত করাও তার শক্তির বাইরে এবং এর উপর নিদ্রা যাওয়া সেটির জন্যে কষ্টকর। বুযুর্গগণের নিয়ম ছিল, তাঁরা উটের পিঠে নিদ্রা যেতেন না; কেবল বসে বসে ঝিমিয়ে নিতেন। তাঁরা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত জন্তুর পিঠে থাকতেন না; বরং কিছু সময় বসতেন এবং কিছু সময় নেমে পায়ে হেঁটে যেতেন। রসূলে

করীম (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা উটের পিঠকে চৌকি বানিয়ে নিয়ো না। কাজেই সকালে জন্তুকে বিশ্রাম দেয়ার জন্যে জন্তুর পিঠ থেকে নেমে পড়া উচিত। এটা সুন্নত। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ থেকেও এ বিষয়টি বর্ণিত আছে। কোন কোন বুযুর্গ জন্তু ভাড়া করার সময় শর্ত করতেন, জন্তুর পিঠ থেকে নামবেন না এবং পূর্ণ ভাড়া দেবেন। এর পর নেমে পড়তেন, যাতে জন্তু আরাম পায় এবং তার সওয়াব তাঁদের আমলনামায় লিখিত হয়, মালিকের আমলনামায় লিখিত না হয়ে।

যেব্যক্তি জন্তুকে কষ্ট দেয় এবং সেটির উপর সাধ্যাতিরিক্ত বোঝা চাপায়, কেয়ামতের দিন তাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। হযরত আবু দারদা (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বে তাঁর উটকে বললেন ঃ কেয়ামতের দিন পরওয়ারদেগারের সামনে আমার সাথে বিতর্ক করবে না। আমি কখনও তোর পিঠে সাধ্যাতিরিক্ত বোঝা চাপাইনি। সারকথা, প্রত্যেক জন্তুর সাথে সদ্ব্যবহার করার মধ্যে সওয়াব রয়েছে। কিছুক্ষণের জন্যে নেমে পড়লে জন্তুও আরাম পায় এবং মালিকও খুশী হয়। এক ব্যক্তি হযরত ইবনে মোবারকের কাছে আরজ করল ঃ অনুগ্রহপূর্বক আপনি আমার চিঠিখানা নিয়ে যান এবং প্রাপককে পৌছে দিন। তিনি বললেন ঃ আমি উটের মালিককে জিজ্ঞেস করে নেই। সে অনুমতি দিলে তোমার চিঠি নিয়ে যাব। আমি উটটি ভাড়া করে নিয়েছি। এ ঘটনায় শিক্ষণীয় যে, চিঠি নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও হযরত ইবনে মোবারক কতটুকু সাবধানতা অবলম্বন করলেন! অথচ চিঠির কোন ওজন হয় না। বলাবাহুল্য, তাকওয়ার ক্ষেত্রে এটাই সতর্কতার পথ। কেননা, বিনানুমতিতে সামান্য ওজন বহন করার পথ খোলা হলে আস্তে আস্তে বেশী বোঝা চাপিয়ে দিতেও মানুষ কুণ্ঠিত হয় না।

(৮) হজ্জে ওয়াজেব না হলেও নৈকট্য লাভের নিয়তে জন্তু যবেহ্ করবে। আর কোরবানীর জন্য উৎকৃষ্ট ও মোটা তাজা জন্তু ক্রয় করার চেষ্টা করবে। নফল কোরবানীর গোশত থেকে নিজে খাবে, ওয়াজেব কোরবানী হলে খাবে না।

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ (যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের সম্মান করে)– এই আয়াতের তফসীরে কেউ কেউ বলেন ঃ আল্লাহর

নিদর্শনসমূহের সম্মান করার অর্থ উৎকৃষ্ট ও মোটাতাজা জন্তু কোরবানী করা।

কোন কষ্ট ও অসুবিধা না হলে মীকাত থেকে কোরবানীর জন্তু সাথে নিয়ে যাওয়া উত্তম। কোরবানীর জন্তু ক্রয় করার সময় কম মূল্যে ক্রয় করার চিন্তা করবে না। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ তিনটি বস্তু বেশী মূল্যে ক্রয় করতেন– এতে কম মূল্যে ক্রয় করার চেষ্টা খারাপ মনে করতেন– হজ্জে যবেহ্ করার জন্তু, কোরবানীর জন্তু এবং গোলাম। কেননা, এগুলোর মধ্যে সেটিই উৎকৃষ্ট ও উত্তম, যার মূল্য বেশী। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁর পিতা হযরত ওমরের ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি একবার হজ্জে যবেহ করার জন্যে একটি উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান উষ্ট্রী সংগ্রহ করেন। লোকেরা তাঁর কাছ থেকে উষ্ট্রীটি তিনশ' আশরাফী দিয়ে কিনে নিতে চাইলে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আরজ করলেন– আপনি অনুমতি দিলে এটি বিক্রয় করে এর মূল্য দিয়ে অনেকগুলো উট নিয়ে নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ না, হাদীর জন্যে এটিই পাঠিয়ে দাও। এর কারণ, উৎকৃষ্ট একটি বস্তু অনেকগুলো নিকৃষ্ট বস্তু অপেক্ষাও শ্রেয়। তখনকার দিনে তিনশ' আশরাফী দিয়ে ত্রিশটি উট কেনা যেত। এতে গোশতের প্রাচুর্য হত। কিন্তু কোরবানীতে গোশত উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে কৃপণতার দোষ থেকে পবিত্র করা এবং খোদায়ী তাযীমের অলংকার দ্বারা অলংকৃত করা। আল্লাহ বলেন–

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآئُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ـ

অর্থাৎ, "আল্লাহর কাছে কোরবানীর জন্তুর মাংস পৌঁছে না, রক্তও না, কিন্তু তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া তথা খোদাভীতি।"

বেশী মূল্যে ক্রয় করলে এ উদ্দেশ্য সাধিত হয়– জন্তুর সংখ্যা কম হোক কিংবা বেশী। এক প্রশ্নের জওয়াবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মকবুল হজ্জ হচ্ছে জোরে লাব্বায়কা বলা এবং উষ্ট্রী কোরবানী করা। হযরত আয়েশার রেওয়ায়েতে তিনি বলেন ঃ কোরবানীর দিন আল্লাহ তাআলার কাছে মানুষের কোন আমল যবেহ্ করার চেয়ে অধিক প্রিয় নয়। এই

কোরবানী কেয়ামতের দিন শিং ও খুরসহ উপস্থিত হবে। এ কোরবানীর রক্ত মাটিতে পড়ার আগে আল্লাহর কাছে একটি মর্তবা অর্জন করে নেয়। অতএব এতে তোমরা মনে মনে খুশি হও। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ তোমাদের জন্যে সেটির ত্বকের প্রতিটি লোমের বদলে সওয়াব রয়েছে এবং রক্তের প্রতিটি ফোঁটার বিনিময়ে নেকী রয়েছে। এগুলো দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হবে। অতএব তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর।

(৯) হজ্জে কোরবানীর জন্তু ও দান খয়রাতে যা ব্যয়িত হয় তজ্জন্য মনে মনে আনন্দিত হবে। অনুরূপভাবে কোন ক্ষতি অথবা আর্থিক ও দৈহিক বিপদ হলে তজ্জন্যে দুঃখ করবে না। এটা হজ্জ কবুল হওয়ার আলামত। হজ্জের পথে ক্ষতি ও বিপদ হলে তাতে এমন সওয়াব পাওয়া যায়, যেমন আল্লাহর পথে এক দেরহাম খরচ করলে তাতে দশ দেরহামের সমান সওয়াব পাওয়া যায়। কথিত আছে, মকবুল হজ্জের অন্যতম আলামত হচ্ছে পূর্বে যে সকল গোনাহ করত, হজ্জের পর সেগুলো না করা। সৎকর্মপরায়ণদের সাথে ভ্রাতৃত্ব করা এবং খেলাধুলা ও গাফিলতির মজলিসের পরিবর্তে আল্লাহর যিকিরের মজলিসে যাতায়াত করা।

নিয়ত খাঁটি করা ও পবিত্র স্থানসমূহ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার উপায়

প্রকাশ থাকে যে, হজ্জে সর্বপ্রথম বুঝতে হবে, ধর্মের মধ্যে এর মর্তবা কি, এর পর হজ্জ করার আগ্রহ হওয়া, ইচ্ছা করা, সকল বাধা-বিপত্তি দূর করা, এহরামের বস্ত্র ক্রয় করা, পাথেয় সংগ্রহ করা, সওয়ারীর জন্তু ভাড়া করা, দেশের বাইরে যাওয়া, পথ অতিক্রম করা, মীকাত থেকে লাব্বায়কা সহকারে এহরাম বাঁধা, মক্কায় প্রবেশ করা এবং পূর্বোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী হজ্জ সম্পন্ন করা। –এসব বিষয়ের প্রত্যেকটিতে উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্যে উপদেশ এবং শিক্ষা গ্রহণকারীদের জন্যে হুশিয়ারী রয়েছে, জ্ঞানীদের জন্যে আছে অর্থবহ ইঙ্গিত।

এক্ষণে আমরা এ সম্পর্কিত কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয় উল্লেখ করছি। এগুলো সম্যক বুঝে এর কারণসমূহ জেনে নিলে প্রত্যেক হাজী

তার অন্তরের স্বচ্ছতা ও আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অনুযায়ী এসবের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।

বোধ– জানা উচিত, মানুষ যে পর্যন্ত কামনা-বাসনা থেকে পবিত্র না হয়, অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সমূহকে যথেষ্ট মনে করে ভোগ-বিলাস থেকে বিরত না হয় এবং তার সকল আচার-আচরণ ও চলাফেরা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যে না হয়ে যায়, সে পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন সম্ভব নয়। এজন্যেই পূর্ববর্তী ধর্মসমূহের অনুসারীরা মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করতো, গভীর বনে অথবা পাহাড়ের চূড়ায় বসবাস করতো এবং আল্লাহ তাআলার সঙ্গ লাভের উদ্দেশে সাময়িক ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করে পরকালীন স্থায়ী সুখের আশায় কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করতো। আল্লাহ তাআলা কোরআন পাকে তাদের প্রশংসা করে বলেন–

ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ -

অর্থাৎ, এটা এ কারণে যে, তাদের মধ্যে রয়েছে জ্ঞানীজন ও সংসারত্যাগী দরবেশ এবং তারা অহংকার করে না।

অতঃপর এ বিষয়টি যখন প্রাচীন হয়ে গেল এবং মানুষ কামনা-বাসনার অনুসরণ করার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আল্লাহ তাআলার এবাদতের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করতে লাগল, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে আখেরাতের পথ পুনঃ প্রবর্তন এবং পূর্ববর্তী রসূলগণের পথে চলা নবায়ন করার জন্যে প্রেরণ করলেন। ইহুদী ও খৃষ্টানরা নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছে ঃ আপনার ধর্মে বৈরাগ্য এবং দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো আছে কিনা? তিনি জওয়াবে বলেছেন– আল্লাহ তাআলা এ দু'টি বিষয়ের বিনিময়ে আমাদেরকে দু'টি বিষয় দান করেছেন– জেহাদ ও উচ্চ ভূমিতে তকবীর বলা, অর্থাৎ, হজ্জ। মোট কথা, এ উম্মতের প্রতি আল্লাহ তাআলার এটা অনুগ্রহ যে, হজ্জকে তাদের জন্যে বৈরাগ্য করে দিয়েছেন, এর পর কাবা গৃহকে 'আমার ঘর' বলে সম্মানিত করেছেন এবং তাকে মানুষের অভীষ্ট সাব্যস্ত করেছেন। তিনি কাবার মাহাত্ম্য বৃদ্ধির জন্যে তার চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমিকে হরম করেছেন এবং আরাফাতকে হরমের সম্মুখবর্তী মাঠের মত করেছেন। এর পর তিনি এ জায়গায় শিকার ও বৃক্ষ কর্তন হারাম করে এর সম্মান অধিকতর জোরদার করে দিয়েছেন। তিনি একে বাদশাহদের দরবারের মত করেছেন। যিয়ারতকারীরা দূর দূরান্ত থেকে মলিন ও ধূলিধূসরিত অবস্থায় প্রভুর জন্যে নতমস্তকে এবং তাঁর প্রতাপ ও ইযযতের সামনে বিনম্র ও বিনীতভাবে চলে আসে। এতদসত্ত্বেও তারা স্বীকার করে যে, আল্লাহ তাআলা কোন গৃহে আবদ্ধ হওয়া এবং কোন শহরে অবস্থান থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। এতে করে তাদের বন্দেগী বেড়ে যায় এবং আনুগত্য ও বশ্যতা পূর্ণতা লাভ করে। এ কারণেই হজ্জে এমন সব ক্রিয়াকর্ম ফরয করা হয়েছে, যার সাথে মানুষ পরিচিত নয় এবং বুদ্ধি-বিবেক যার কারণ খুঁজে পায় না। উদাহরণতঃ প্রস্তরের উপর কংকর নিক্ষেপ করা, সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে কয়েক বার আসা-যাওয়া করা ইত্যাদি। এ ধরনের ক্রিয়াকর্ম দ্বারা পূর্ণ বন্দেগী প্রকাশ পায়। কেননা, অন্যান্য ক্রিয়াকর্মে কিছু মানসিক আনন্দ আছে; যেমন যাকাতে দানশীলতা আছে, মন থেকে কৃপণতা দূর করা এর কারণ। এটা বিবেক বুদ্ধির কাম্য। রোযার মধ্যে পাশবিক প্রবৃত্তির দমন আছে, যা শয়তানের হাতিয়ার। নামাযে সেজদা, রুকু ও অন্যান্য নম্রতাসূচক কাজকর্ম করে আল্লাহ তাআলার জন্যে বিনম্র হওয়া আছে এবং আল্লাহর তাযীমের সাথে বান্দা পরিচিত। কিন্তু সায়ীর চক্কর, কংকর নিক্ষেপ এবং এ ধরনের অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম পালন করার কারণ আল্লাহর আদেশ প্রতিপালন বৈ কিছু নয়। কেননা, আল্লাহর আদেশ অবশ্য পালনীয় হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বিবেক বুদ্ধির তৎপরতা শিকায় উঠে। কেননা, যেসকল বিষয়ের গূঢ়তত্ত্ব বিবেক বুঝে ফেলে, সেগুলোর প্রতি মনের কিছু আগ্রহ থাকে। এ আগ্রহই সে বিষয়টি পালন করতে উৎসাহ যোগায়। এ ধরনের আদেশ প্রতিপালন দ্বারা পূর্ণ দাসত্ব ও আনুগত্য প্রকাশ পায় না। এ কারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ) বিশেষভাবে হজ্জ সম্পর্কে এরশাদ করেন ঃ لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا আমি উপস্থিত আছি সত্যিকার হজ্জের জন্যে এবং বন্দেগীর জন্যে। এ কথা তিনি নামায, রোযা ইত্যাদির বেলায় বলেননি।

মানুষের মুক্তিকে তাদের মনের চাহিদা বিরুদ্ধ ক্রিয়াকর্মের সাথে জড়িত করা এবং মুক্তির লাগাম শরীয়তের এখতিয়ারে রাখা– এ দু'টি বিষয় খোদায়ী রহস্যের কাম্য ছিল, যাতে মানুষ তাদের ক্রিয়াকর্মে আনুগত্যের উপায় সম্পর্কে ইতস্ততঃ করে। এ জন্যে যেসব ক্রিয়াকর্মের কারণ অনুসন্ধানে বিবেক বুদ্ধি পথ পায় না, আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে সেগুলো অবশ্যম্ভাবীরূপে সকল এবাদতের চেয়ে পূর্ণাঙ্গতম এবাদত প্রতিপন্ন হয়েছে। কেননা, মনকে স্বভাব চরিত্রের চাহিদা থেকে সরিয়ে দেয়া গোলামীর লক্ষ্য। এ থেকেই বুঝা যায়, এবাদতসমূহের রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই হজ্জের বিচিত্র ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়। মূল হজ্জ বুঝার জন্যে এতটুকু বর্ণনাই ইনশাআল্লাহ্ যথেষ্ট।

আগ্রহ– এ বিষয়টি যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করা থেকেই অন্তরে হজ্জ করার আগ্রহ জাগে এবং বিশ্বাস জন্মে যে, গৃহটি আল্লাহ জাল্লা শানুহুর। তিনি একে রাজকীয় দরবারের অনুরূপ করেছেন। অতএব যেব্যক্তি এ দরবার অভিমুখে যাত্রা করে, সে আল্লাহর দিকে যাত্রা করে এবং তাঁর যিয়ারত করে। যেব্যক্তি দুনিয়াতে এ গৃহে যাওয়ার ইচ্ছা করে, তার যিয়ারত বিনষ্ট না হওয়া এবং নির্দিষ্ট সময়ে তার খোদায়ী দীদার নসীব হওয়াই সমীচীন। কেননা, দুনিয়াতে দৃষ্টিশক্তির ত্রুটি ও ধ্বংসশীলতার কারণে দীদারের নূর কবুল করা ও তা সহ্য করার ক্ষমতা নেই। পরজগতে দৃষ্টিশক্তি স্থায়িত্বের সহায়তা লাভ করবে এবং পরিবর্তন ও ধ্বংসের কবল থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তাই তখন নজর ও দীদারের যোগ্যতা সৃষ্টি হবে। এতদসত্ত্বেও কাবা গৃহে যাওয়ার ইচ্ছা করা ও তার দিকে দৃষ্টিপাত করার কারণে খোদায়ী ওয়াদা অনুযায়ী কাবার মালিককে দেখার হক সৃষ্টি হয়ে যাবে। সুতরাং খোদায়ী দীদারের আগ্রহ কাবা দর্শনের প্রতি আগ্রহান্বিত করবে। কেননা, কাবার দীদার আল্লাহর দীদারের কারণ। এছাড়া আশেকের মনে মাশুকের বস্তুর প্রতি ঔৎসুক্য স্বাভাবিকভাবেই থাকে। কাবা আল্লাহ তাআলার গৃহ। সুতরাং কেবল এই সম্পর্কের দিকে দিয়েই কাবার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে প্রতিশ্রুত সওয়াব লাভের আকাঙ্ক্ষা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া উচিত।

ইচ্ছা– এ ব্যাপারে এরূপ চিন্তা করবে, কাবা গৃহের যিয়ারতের উদ্দেশেই সে আপন পরিবার-পরিজন ত্যাগ করতে এবং কামনা বাসনা ও ভোগবিলাস বিসর্জন দিতে ইচ্ছুক হয়েছে। সুতরাং সে কাবা গৃহ ও তার

মালিকের মর্যাদা খুব বড় মনে করবে। তার জানা উচিত, সে এক বিরাট কাজের ইচ্ছা করেছে যা অত্যন্ত কষ্টকর। যে বড় কাজের অন্বেষী হয়, সে বড় কষ্টে পড়ে। সে তার ইচ্ছাকে একান্তভাবে আল্লাহর জন্যে নিবিষ্ট করবে এবং রিয়া ও সুখ্যাতি থেকে দূরে রাখবে। একথা মনে গেঁথে নেবে, একমাত্র খাঁটি ইচ্ছা ও কর্মই মকবুল হবে। এটা খুবই মন্দ কথা, মানুষ বাদশাহের গৃহ ও হরমের নিয়ত করবে আর লক্ষ্য অন্য কিছু সাব্যস্ত করে নেবে। সুতরাং যা উৎকৃষ্ট, তার পরিবর্তে নিকৃষ্টকে অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকা জরুরী।

সম্পর্কচ্ছেদ– এর উদ্দেশ্য, সকল হকদারকে তাদের হক সমর্পণ করবে এবং যাবতীয় গোনাহ থেকে খাঁটিভাবে তওবা করবে। কেননা, হকও একটি সম্পর্ক এবং প্রত্যেক সম্পর্ক একজন কর্জদাতার অনুরূপ, যে জামার কলার চেপে ধরে বলে ঃ তুমি কোথায় যাচ্ছ? শাহানশাহের গৃহে যেতে চাও, অথচ আপন গৃহে তাঁর আদর্শকে তুচ্ছ জ্ঞান করে পালন করছ না? তুমি যদি চাও, তোমার যিয়ারত কবুল হোক, তবে তাঁর আদেশ পালন কর। জুলুমের মাধ্যমে যাদের হক ছিনিয়ে নিয়েছ, তাদের হক প্রত্যর্পণ কর। সর্বপ্রথম গোনাহ থেকে তওবা কর এবং অন্তরকে সকল দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে নাও, যাতে শাহানশাহের দিকে অন্তরের চেহারা দিয়ে মনোনিবেশ করতে পার। যেমন বাহ্যতঃ তুমি তাঁর গৃহের দিকে মুখ করে আছ। এরূপ না করলে তুমি এই সফর থেকে শুরুতে দুঃখ-কষ্ট এবং পরিণামে ধিকৃত হওয়া ছাড়া আর কিছুই পাবে না। দেশের সাথে সম্পর্ক এমনভাবে বিচ্ছিন্ন করবে যেন সেখান থেকে চিরতরে বিদায় নেয়া হচ্ছে। মনে করে নেবে যেন সেখানে আর ফিরে আসবে না। পরিবার পরিজন ও সন্তানদের জন্য ওসিয়ত লেখে দেবে। কেননা, মুসাফির ব্যক্তি মৃত্যুর লক্ষ্যস্থল হয়ে থাকে; তবে যাকে আল্লাহ্ রক্ষা করেন তার কথা ভিন্ন। হজ্জের সফর করার জন্যে সম্পর্ক ছিন্ন করার সময় স্মরণ করবে, পরকালের সফরের জন্যেও এমনিভাবে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। এ সফর সত্বরই করতে হবে। হজ্জের সফরে যা কিছু করবে তা দ্বারা পরকালের সফর সহজ হওয়ার আশা করবে। এ জন্যে প্রস্তুতিতে পরকালের সফর বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

পাথেয়– হালাল জায়গা থেকে পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত। যদি মনে বাসনা থাকে, পাথেয় অনেক হোক, দূর-দূরান্তের সফর সত্ত্বেও তা উদ্বৃত্ত হোক এবং মনযিলে মকসুদ পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বে তা ক্ষয়প্রাপ্ত ও পরিবর্তিত না হোক, তবে স্মরণ রাখা উচিত, পরকালের সফর এ সফরের তুলনায় অনেক দীর্ঘ। তার পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া বা খোদাভীতি। তাকওয়া ব্যতীত অন্য যে বস্তুকে পাথেয় জ্ঞান করা হয় তা মৃত্যুর সময় পশ্চাতে থেকে যাবে এবং ধোঁকা দেবে; যেমন টাট্‌কা রান্না করা খাদ্য সফরের প্রথম মনযিলেই বাসী হয়ে পচে যায়। এর পর ক্ষুধার সময় মানুষ তা খেতে পারে না। কাজেই যে আমল পরকালের পাথেয় সেই আমল যাতে মৃত্যুর পর সঙ্গ ত্যাগ না করে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরী।

আরোহণের জন্তু– সফর করার সময় যখন আরোহণের জন্তু সামনে আসে, তখন মনে মনে আল্লাহর নেয়ামতের শোকর করবে যে, তিনি চতুষ্পদ জন্তুকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যাতে কষ্ট না হয় এবং সফর হাল্‌কা হয়। এ ছাড়া স্মরণ করবে, পরজগতের সওয়ারী একদিন এমনিভাবে সামনে আসবে অর্থাৎ জানাযার প্রস্তুতি হবে এবং তাতে সওয়ার হয়ে পরজগতের সফর করতে হবে। মোট কথা, হজ্জের অবস্থা কিছুটা পরজগতের সফরের অনুরূপ বিধায় জন্তুর পিঠে হজ্জের সফর করাটা পরজগতের পাথেয় হয় কিনা, তা অবশ্যই দেখে নেয়া উচিত। কেননা, পরজগতের সফর মানুষের খুবই নিকটবর্তী। কে জানে মৃত্যু নিকটেই কিনা এবং উটের উপর সওয়ার হওয়ার পূর্বেই শবাধারের উপর সওয়ার হয়ে যাবে কিনা। শবাধারের উপর অবশ্যই সওয়ার হতে হবে। পক্ষান্তরে পাথেয় সংগ্রহ অনিশ্চিত বিধায় হজ্জের সফরও একটি অনিশ্চিত ব্যাপার। সুতরাং অনিশ্চিত সফরে সাবধান হওয়া এবং পাথেয় ও সওয়ারীর জন্তুর সাহায্য নেয়া আর নিশ্চিত সফরের ব্যাপারে গাফেল থাকা কিরূপে শোভনীয় হতে পারে?

এহরামের পোশাক– এহরামের পোশাক ক্রয় করার সময় আপন কাফনও তাতে জড়ানোর কথা স্মরণ করবে। কেননা কাবা গৃহের নিকটে পৌঁছে এহরামের লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করবে। সে পর্যন্ত সফর পূর্ণ হয় কিনা কে জানে। কাফনে জড়ানো অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ

নিশ্চিত। আল্লাহর ঘরের যিয়ারত যেমন সাধারণ পোশাক পরিচ্ছদের বিপরীত পোশাক ছাড়া হয়নি, তেমনি মৃত্যুর পর আল্লাহর যিয়ারতও সেই পোশাক ব্যতীত হবে না, যা দুনিয়ার পোশাকের বিপরীত। এহরামের পোশাকও কাফনের কাপড়ের অনুরূপ সেলাইবিহীন।

শহর থেকে বের হওয়ার সময় মনে করবে, আমি আমার দেশবাসী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এমন সফরে যাচ্ছি, যা দুনিয়ার সফরের অনুরূপ নয়। তখন সে মনে মনে চিন্তা করবে, কিসের ইচ্ছা করছে, কোথায় যাচ্ছে এবং কার যিয়ারত করতে রওয়ানা হচ্ছে। তখন বুঝে নেবে, সে রাজাধিরাজের পানে তার যিয়ারতকারীদের দলভুক্ত হয়ে অগ্রসর হচ্ছে, যারা ডাক দেয়ার সাথে সাথে উপস্থিত হয়েছে, প্রেরণা দেয়ার সাথে সাথে আগ্রহান্বিত হয়েছে এবং আদেশ পেয়ে দূরদূরান্ত এলাকা অতিক্রম করে সকলকে ত্যাগ করে মহীয়ান ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী গৃহ অভিমুখে ধাবিত হয়েছে, যাতে প্রভুর যিয়ারতের পরিবর্তে তার গৃহের যিয়ারত করে অন্তর তুষ্ট করতে এবং অভীষ্ট কামনা সিদ্ধ করতে পারে। অন্তরে কবুলের প্রত্যাশা রাখবে। আপন আমলের উপর ভরসা না করে আল্লাহ তাআলার কৃপার উপর ভরসা করবে। তিনি তাঁর গৃহের যিয়ারতকারীদের জন্যে উত্তম প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন। কাজেই প্রত্যাশা করবে, তিনি আপন ওয়াদা পূর্ণ করবেন। আরও আশা রাখবে, যদি তুমি কাবা গৃহ পর্যন্ত পৌঁছতে না পার এবং পথিমধ্যে মারা যাও, তবে আল্লাহর সাথে তাঁর পথের পথিক অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে। কেননা, তিনি নিজে বলেন–

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ ـ

যেব্যক্তি দেশত্যাগী অবস্থায় তার গৃহ থেকে আল্লাহ ও রসূলের উদ্দেশে রওয়ানা হয়, এর পর মারা যায়, তার সওয়াব আল্লাহর কাছে নির্ধারিত হয়ে যায়।

জঙ্গলে প্রবেশ করে মীকাত পর্যন্ত গিরিপথসমূহ দেখার সময় সেসব ভয়ংকর অবস্থা স্মরণ করবে যা মৃত্যুর পর দুনিয়া থেকে বের হয়ে কেয়ামতের মীকাত পর্যন্ত সংঘটিত হবে। এর প্রত্যেক অবস্থার সাথে

কেয়ামতের প্রত্যেক অবস্থার মিল খুঁজে নেবে। উদাহরণতঃ দস্যুদের আতংক দ্বারা মুনকার নকীরের প্রশ্নের আতংক স্মরণ করবে। জঙ্গলের হিংস্র প্রাণীদের দ্বারা কবরের সাপ বিচ্ছু ধ্যান করবে। আপন বাড়ীঘর ও আত্মীয়-স্বজনের বিরহ দ্বারা কবরের ত্রাস, কঠোরতা ও একাকিত্ব চিন্তা করবে। মোট কথা, আপন কথায় ও কাজে যে ভয় করবে, তা কবরের ভয়ের জন্যে পাথেয় করবে। মীকাতে 'লাব্বায়কা' বলার অর্থ এই মনে করবে, আল্লাহর ডাকে 'হাযির আছি' বলে সাড়া দিচ্ছে। তখন এই সাড়া কবুল হওয়ার আশা করবে এবং ভয় করবে, কোথাও لا لبيك ولا سعديك না বলে দেয়া হয়; অর্থাৎ, তুমি হাযির নও এবং তৎপর নও। তাই ভয় ও আশার মাঝখানে থাকবে এবং নিজের শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্ তাআলার কৃপার উপর ভরসা রাখবে। কেননা, 'লাব্বায়কা' বলার সময়ই হচ্ছে হজ্জের সূচনা এবং এটা বিপদের সময়। সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না বলেন ঃ একবার হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রঃ) হজ্জের এহরাম বেঁধে সওয়ারীর উপর বসতেই তাঁর শরীরের রং ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তিনি কাঁপতে লাগলেন এবং নিজের মধ্যে 'লাব্বায়কা' বলার শক্তি পেলেন না। কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি 'লাব্বায়কা' বলছেন না কেন? তিনি বললেন ঃ আমার আশংকা হয়, কোথাও আমাকে لا لبيك ولا سعديك বলে না দেয়া হয়। এর পর যখন তিনি 'লাব্বায়কা' বললেন, তখন অজ্ঞান হয়ে সওয়ারী থেকে নীচে পড়ে গেলেন। হজ্জ পূর্ণ করা পর্যন্ত তাঁর এ অবস্থাই বিদ্যমান ছিল। আহমদ ইবনে আবিল হাওয়ারী বলেন ঃ আমি আবু সোলায়মান দারানীর সাথে একবার হজ্জে গিয়েছিলাম। তিনি এহরাম বেঁধে এক মাইল পর্যন্ত চুপচাপ চলে এলেন এবং 'লাব্বায়কা' বললেন না। এর পর তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং সংজ্ঞা ফিরে আসার পর বললেন ঃ হে আহমদ! আল্লাহ্ তাআলা হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে এই মর্মে ওহী প্রেরণ করেন, বনী ইসরাঈলের জালেমদেরকে বলে দাও তারা যেন আমাকে কম স্মরণ করে। কেননা, তাদের মধ্যে যে আমাকে স্মরণ করে, আমি তাকে অভিসম্পাত সহকারে স্মরণ করি। হে আহমদ! আমি শুনেছি, যেব্যক্তি অবৈধ হজ্জ করে এবং লাব্বায়কা বলে, আল্লাহ্ তাআলা তার জওয়াবে বলেন ঃ

لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما فى يديك তুমি উপস্থিত নও এবং তৎপর নও, যে পর্যন্ত তোমার হাতে যা আছে তা ফিরিয়ে না দাও। অতএব, আমিও এরূপ জওয়াব পাওয়া থেকে শংকামুক্ত নই।

আল্লাহ বলেছেন- وَأَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা প্রচার কর। এ ডাকের জওয়াব দেয়ার উদ্দেশ্যে যখন মীকাতে সজোরে 'লাব্বায়কা' বলবে তখন ধ্যান করবে, শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার কারণে মানুষ এমনিভাবে আহূত হবে এবং কবর থেকে উঠে কেয়ামতের মাঠে একত্রিত হবে। তাদের অনেক প্রকার থাকবে। কেউ হবে নৈকট্যশীল এবং কেউ আল্লাহর গজবে নিপতিত। কেউ গৃহীত হবে এবং কেউ নিগৃহীত। তারা শুরুতে ভয় ও আশার মধ্যে দোদুল্যমান থাকবে; যেমন মীকাতে হাজীগণ হজ্জ পূর্ণ করতে পারবে কিনা এবং হজ্জ কবুল হবে কিনা, সে বিষয়ে দোদুল্যমান থাকে। মক্কায় প্রবেশ করার সময় মনে করবে, এখন নিরাপদে হরমে পৌঁছে গেছি। আশা করবে, মক্কায় প্রবেশের বদৌলত আল্লাহ্ তাআলা আযাব থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন। আশংকা করবে, যদি আমি নৈকট্যের যোগ্য না হই, তবে হরমে আসার কারণে গোনাহগার ও গজবের যোগ্য সাব্যস্ত হব। কিন্তু সব সময় আশা প্রবল থাকা উচিত। কেননা, আল্লাহর অনুকম্পা ব্যাপক এবং কাবা গৃহের সম্মান অত্যধিক। যারা আসে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ কৃপা করেন এবং যারা এর আশ্রয় চায় ও দোহাই দেয়, তাদের সম্মান বিনষ্ট করেন না।

কাবা গৃহের উপর দৃষ্টি পড়ার সময় তাঁর মাহাত্ম্য অন্তরে উপস্থিত করবে এবং মনে করবে যেন গৃহের প্রভুকে দেখতে পাচ্ছ। তখন আশা করবে, আল্লাহ্ তাআলা যেমন তাঁর মহান গৃহ দেখা নসীব করেছেন, তেমনি তাঁর পবিত্র সত্তার দীদারও নসীব করবেন। আল্লাহ্ তাআলার শোকর করবে, তিনি এমন মর্তবায় উন্নীত করেছেন এবং তাঁর কাছে আগমনকারীদের দলভুক্ত করেছেন। তখন একথাও ধ্যান করবে যে, কেয়ামতে সকল মানুষ জান্নাতে দাখিল হওয়ার আশায় এমনিভাবে জান্নাতের পানে ধাবিত হবে। এর পর তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। কিছু লোক ভিতরে প্রবেশের অনুমতি পাবে এবং কিছু লোককে ফিরিয়ে দেয়া হবে। যেমন হাজীদের দু'টি দল হয়েছে- এক দলের হজ্জ কবুল এবং এক দলের হজ্জ নামঞ্জুর। হজ্জে যেসকল পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে,

সেগুলো দেখে আখেরাতের বিষয়াদির স্মরণ থেকে গাফেল হওয়া উচিত হবে না। কারণ, হাজীদের সকল অবস্থা আখেরাতের অবস্থা জ্ঞাপন করে।

কাবা গৃহের তওয়াফকে নামায গণ্য করবে। তাই তওয়াফের সময় অন্তরে তাযীম, ভয়, আশা ও মহব্বত এমনভাবে হাযির করবে, যেমন 'নামাযের রহস্য' অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছি। প্রকাশ থাকে যে, তওয়াফের দিক দিয়ে মানুষ সেই সকল নৈকট্যশীল ফেরেশতার অনুরূপ হয়ে যায়, যারা আরশের চার পাশে সমবেত হয়ে তওয়াফ করে। এটা মনে করবে না যে, তওয়াফের উদ্দেশ্য দেহের তওয়াফ করা; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের অন্তরের যিকিরের তওয়াফ প্রভুর চার পাশে করা। ফলে তওয়াফের সূচনা ও শেষ যেমন কাবা গৃহের উপর হয়, তেমনি যিকিরের সূচনা ও শেষ প্রভুর উপরই হতে হবে।

জানা উচিত, উৎকৃষ্ট তওয়াফ হচ্ছে অন্তরের তওয়াফ, যা আল্লাহর দরবারের চার পাশে হয়। কাবা গৃহ বাহ্যিক জগতে সেই দরবারের একটি নমুনা। কেননা, আল্লাহর দরবার আভ্যন্তরীণ জগতে অবস্থিত। ফলে চোখে দৃষ্টিগোচর হয় না। যেমন বাহ্যিক জগতে দেহ অন্তরের নমুনা। অন্তর অদৃশ্য জগতে রয়েছে, ফলে চোখে দৃষ্টিগোচর হয় না। আরও জেনে নেবে, বাহ্যিক জগত অদৃশ্য জগতের সিঁড়ি সেই ব্যক্তির জন্যে, যার জন্যে আল্লাহ্ এই দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে এই উক্তির মধ্যে। বায়তুল মামুর আকাশে কা'বার বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত। ফেরেশতারা তার তওয়াফ করে, যেমন মানুষ কাবার তওয়াফ করে। অধিকাংশ মানুষ এ ধরনের তওয়াফ করতে অক্ষম বিধায় সাধ্যমত সেই ফেরেশতাদের সাথে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করার জন্যে তাদেরকে কাবা গৃহের তওয়াফ করার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং ওয়াদা করা হয়েছে, যারা কোন সম্প্রদায়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখে, তারা তাদের মধ্যে গণ্য হবে। আর যেব্যক্তি ফেরেশতাদের অনুরূপ তওয়াফ করতে সক্ষম, সে এমন ব্যক্তি, যার সম্পর্কে বলা যায়, স্বয়ং কাবা তার যিয়ারত ও তওয়াফ করে। কতক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বুযুর্গ কোন কোন ওলী আল্লাহর অবস্থা এমনি দেখেছেন।

'হাজারে আসওয়াদ' (কৃষ্ণ প্রস্তর) চুম্বন করার সময় এই বিশ্বাস রাখবে যে, আল্লাহ তাআলার সাথে তাঁর আনুগত্যের শপথ করছো। অতঃপর এই শপথ পূর্ণ করার জন্যে কৃতসংকল্প হবে। কেননা, যেব্যক্তি

শপথ ভঙ্গ করে, সে গজবের যোগ্য হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

الحجر الاسود يمين الله عز وجل فى الارض يصافح

بها خلقه كما يصلح الرجل اخاه

অর্থাৎ, 'হাজারে আসওয়াদ' পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার দক্ষিণ হস্ত। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর সৃষ্ট মানবের সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করেন, যেমন মানুষ তার ভাইয়ের সাথে করমর্দন করে। কা'বার গেলাফ ধারণ এবং মুলতাযামকে ধরার সময় নিয়ত করবে, গৃহ এবং গৃহের প্রভুর মহব্বতে নৈকট্য অন্বেষণ করছো। দেহের স্পর্শকে বরকত মনে করবে এবং আশা করবে, দেহের যে অংশ কা'বার সাথে সংযুক্ত হবে, তা অগ্নি থেকে হেফাযতে থাকবে। গেলাফ ধরার সময় নিয়ত করবে, মাগফেরাত ও শান্তির অন্বেষণে কাকুতি-মিনতি ও পীড়াপীড়ি করছো; যেমন কোন অপরাধী যার কাছে অপরাধ করে, তার আঁচল জড়িয়ে ধরে, অপরাধের জন্যে তার সামনে মিনতি সহকারে প্রকাশ করে, তুমি ব্যতীত আমার কোথাও ঠিকানা নেই। এখন আমি তোমার আঁচল ছাড়ব না যে পর্যন্ত না অপরাধ ক্ষমা কর এবং ভবিষ্যতের জন্যে অভয় না দাও।

কা'বা গৃহের চত্বরে সাফা ও মারওয়ার মধ্যস্থলে সায়ী তথা দৌড়াদৌড়ি এমন, যেমন গোলাম বাদশাহের প্রাসাদের চত্বরে বার বার আনাগোনা করে, যাতে খেদমতে আন্তরিকতা প্রকাশ পায় এবং রহমতের দৃষ্টি লাভ করে ধন্য হয়ে যায়। অথবা যেমন কেউ বাদশাহের কাছে যায়, এর পর বাইরে চলে আসে কিন্তু একথা জানে না, বাদশাহ্ তার সম্পর্কে কি আদেশ করবেন– মঞ্জুর করবেন, না নামঞ্জুর করবেন। ফলে সে বার বার প্রাসাদের চত্বরে আসা-যাওয়া করে যে, প্রথম বারে রহম না করলে দ্বিতীয় বারে রহম করবেন। সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে আসা-যাওয়া করার সময় মনে করবে, কেয়ামতের ময়দানে মীযানের উভয় পাল্লার মাঝখানে এমনিভাবে ঘুরাফেরা করতে হবে। সাফাকে নেকীর পাল্লা এবং মারওয়াকে বদীর পাল্লা মনে করে নেবে। এর পর ধারণা করবে, এই পাল্লাদ্বয়ের মাঝখানে এমনিভাবে আসা-যাওয়া করতে হবে এটা দেখার জন্যে যে, কোন্ পাল্লাটি ভারী হয় এবং কোন্‌টি হালকা।

আরাফাতে অবস্থান করার সময় যখন মানুষের ভীড়, উচ্চ আওয়ায, ভাষার বিভিন্নতা এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আপন আপন ইমামের পায়ের সাথে পা মিলিয়ে চলা দেখবে, তখন একথা স্মরণ করবে, কেয়ামতের ময়দানেও সকল উম্মত আপন আপন পয়গম্বরসহ এমনিভাবে একত্রিত হবে এবং প্রত্যেক উম্মত তাদের পয়গম্বরের অনুসরণ করবে। তারা তাঁদের শাফায়াত আশা করবে এবং কবুল হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে পেরেশান থাকবে। আরাফাতে যখন এই ধারণা মনে উদয় হয়, তখন কাকুতি-মিনতি ও আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া অপরিহার্য করে নেবে, যাতে কামিয়াব ও রহমতপ্রাপ্ত দলের সাথে হাশর হয়। এ স্থানে নিজের আশা কবুলই মনে করবে। কেননা, এই দরবার শরীফে আল্লাহর রহমত সকলের উপর নাযিল হয়। এই রহমত আসার ওসিলা হয় কুতুব ও আবদালগণের অন্তর। কুতুব ও আবদালের দল থেকে এ ময়দান কখনও খালি থাকে না। সৎকর্মপরায়ণগণও এখানে অবশ্যই বিদ্যমান থাকেন। সুতরাং হিম্মত একত্রিত হয়ে যখন তাদের অন্তর মিনতি করতে তাঁকে, হাত আল্লাহর দিকে প্রসারিত হয়, মস্তক তাঁর দিকে উত্তোলিত হয় এবং হিম্মত সহকারে রহমত তলব করার জন্যে তারা আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করেন, তখন এরূপ ধারণা করবে না যে, তারা আপন আশায় বঞ্চিত থাকবেন এবং তাদের প্রচেষ্টা নিষ্ফল হবে। বরং তখন তাদের উপর সর্বব্যাপী রহমত নাযিল হয়। এ কারণেই বলা হয়, আল্লাহ তাআলা আমার মাগফেরাত করেননি– আরাফাতে উপস্থিত থেকে এরূপ ধারণা করা গোনাহ্। হিম্মতসমূহের সমাবেশই হজ্জের রহস্য ও চূড়ান্ত লক্ষ্য। হিম্মতসমূহের একত্রিত হওয়া এবং এক জায়গায় একই সময়ে অন্তরসমূহের একে অন্যকে সাহায্য করা– আল্লাহর রহমত নামিয়ে আনার এর চেয়ে উত্তম পন্থা আর নেই।

কংকর নিক্ষেপের মধ্যে ইচ্ছা করবে, বন্দেগী প্রকাশ করার জন্যে আদেশ পালন করছ। এ কাজে বিবেক ও মনের কোন আনন্দ নেই। এর স্থলে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সামনে বিতাড়িত শয়তান আত্মপ্রকাশ করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর হজ্জে কিছু সন্দেহ সৃষ্টি করা অথবা তাঁকে কোন গোনাহে লিপ্ত করা। কিন্তু আল্লাহ তাআলা শয়তানকে বিতাড়িত এবং তার আশা বিনষ্ট করার জন্যে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে কংকর

নিক্ষেপের আদেশ করেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে সামঞ্জস্যের ইচ্ছা করবে। যদি কেউ বলে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) শয়তানের আত্মপ্রকাশ প্রত্যক্ষ করেছিলেন বিধায় তাকে কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন। আমাদের সামনে শয়তান আত্মপ্রকাশ করে না, এমতাবস্থায় কংকর মারার উদ্দেশ্য কি? এর জওয়াব হচ্ছে, এই আপত্তি শয়তানের পক্ষ থেকে। সে-ই আমাদের মনে এটা জাগ্রত করেছে– যাতে আমাদের কংকর মারার ইচ্ছা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আমরা মনে করি, এটা তো খেলাধুলার মত একটা নিষ্ফল কাজ। এটা আমরা করব কেন? সুতরাং আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে মজবুত হয়ে শয়তানকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশে কংকর নিক্ষেপ করতঃ তাকে প্রতিহত করতে হবে। এখানে বুঝতে হবে, আমরা প্রস্তরের উপর কংকর নিক্ষেপ করলেও বাস্তবপক্ষে তা শয়তানের মুখে মারি এবং তার পিঠ ভেঙ্গে দেই। কেননা, যে আদেশ পালনে মন ও বিবেকের কোন আনন্দ নেই, তা পালন করার মধ্যেই শয়তানের লাঞ্ছনা ও অবমাননা নিহিত রয়েছে।

কোরবানীর জন্তু যবেহ্ করার সময় জানবে, এ কাজ আদেশ প্রতিপালনের কারণে নৈকট্যশীল এবাদত। এ কারণেই জন্তুটি এবং জন্তুর অঙ্গসমূহ উৎকৃষ্ট হওয়া উচিত। এতে আশা করা উচিত, আল্লাহ তাআলা এর প্রত্যেক অঙ্গের বিনিময়ে আমাদের প্রত্যেক অঙ্গকে অগ্নি থেকে মুক্ত করবেন। এরূপই ওয়াদা হয়েছে। সুতরাং জন্তুটি যত বড় হবে এবং তার অঙ্গ যত বেশী সবল হবে, ততই দোযখের অগ্নি থেকে রেহাই বেশী হবে।

মদীনা মুনাওয়ারার প্রাচীরসমূহের উপর নজর পড়লে মনে মনে ধ্যান করা উচিত, এটি সেই শহর, যাকে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী (সাঃ)-এর জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তাঁর দারুল হিজরত করেছেন। এ স্থানেই তিনি আল্লাহ তাআলার ফরয ও সুনান জারি করেছেন এবং তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছেন। এখানেই তিনি আল্লাহর ধর্ম প্রচার করেছেন। অবশেষে আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে ডেকে নিয়েছেন এবং এখানেই তাঁর সমাধি রচনা করেছেন। রসূলের দু'জন উযীরের কবরও এখানে রেখেছেন, যারা তাঁর পরে সত্য প্রচারে ব্রতী হন। এর পর মনে মনে কল্পনা করবে,

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পদযুগল মদীনার মাটিতে পড়ে থাকবে এবং তাঁর পা পড়েনি এমন কোন জায়গা নেই। এরূপ কল্পনা করার পর গাম্ভীর্য ও ভয় সহকারে মাটিতে পা রাখবে এবং চিন্তা করবে, পাক মদীনার প্রত্যেক অলিগলিতে তিনি বিচরণ করে থাকবেন। এর পর তাঁর চলাফেরার গতিতে মিনতি ও গাম্ভীর্য কল্পনা করবে। আরও কল্পনা করবে, আল্লাহ তাআলা নিজের কি পরিমাণ মারেফত তাঁর অন্তরে গচ্ছিত রেখেছিলেন। তিনি তাঁর যিকিরকে কতটুকু উচ্চ করেছেন যে, নিজের যিকিরের সাথে তাঁর যিকির সংযুক্ত করে দিয়েছেন। যেব্যক্তি তাঁর তাযীম করে না, আল্লাহ তার আমল বাতিল করে দেন। এর পর ধ্যান করবে, আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ তাদের প্রতি যারা তাঁর সংসর্গ লাভ করেছেন এবং সৌন্দর্য দর্শন ও বাণী শ্রবণের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। এর পর নিজের জন্য আফসোস করবে যে, এ দৌলত তোমার নসীব হয়নি এবং সাহাবীগণের সঙ্গও নসীব হয়নি। এর পর ধ্যান করবে দুনিয়াতে তো তাঁর যিয়ারত ভাগ্যে জুটল না, আখেরাতে জুটবে কিনা সন্দেহ। গোনাহের কারণে সম্ভবতঃ পরিতাপের দৃষ্টিতেই তাঁকে দেখতে হবে। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– কেয়ামতের দিন কিছু লোককে আমার সম্মুখে আনা হবে। তারা বলবে ঃ হে মুহাম্মদ! আমি বলব ঃ ইলাহী, এরা আমার উম্মত। আল্লাহ বলবেন ঃ আপনি জানেন না, আপনার পরে এরা কি সব নতুন কর্ম উদ্ভাবন করেছে। তখন আমি বলব ঃ দূর হয়ে যাও। দূর হয়ে যাও, দূর হয়ে যাও, সুতরাং যদি তুমিও তাঁর শরীয়তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে থাক, তবে তোমার ও তাঁর মধ্যে দূরত্ব হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। তবে আশা এটাই রাখবে, আল্লাহ তাআলা তোমার ও তাঁর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করবেন না। কেননা, আল্লাহ তোমাকে ঈমান দান করেছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যিয়ারতের জন্যে তোমাকে তোমার দেশ থেকে বের করে এনেছেন। কোন ব্যবসা বাণিজ্য অথবা জাগতিক আনন্দ তোমার উদ্দেশ্য ছিল না। কেবল তাঁর মহব্বত এবং তাঁর পবিত্র কীর্তি দেখার আগ্রহ তোমাকে টেনে এনেছে। কেননা, তাঁকে দেখা যখন তোমার নসীব হল না, তখন তাঁর কবরের প্রাচীরের উপর দৃষ্টি পতিত হওয়াতেই তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ। আল্লাহ তাআলা এসব আয়োজন যখন তোমার জন্যে করেছেন, তখন তোমার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে দেখবেন– এটাই তাঁর জন্যে উপযুক্ত।

যখন তুমি মসজিদে নববীতে পৌঁছবে তখন ধ্যান করবে, এ স্থানকেই আল্লাহ তাআলার নবী (সাঃ) এবং মুসলমানের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বোত্তম লোকদের জন্যে মনোনীত করেছেন। আল্লাহর ফরযসমূহ প্রথমে এস্থানেই পালিত হয়েছে। এস্থানেই সৃষ্টির সেরা ব্যক্তিবর্গ জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরেও সমবেত আছেন। এমন স্থানে প্রবেশ করায় তোমার খুব আশা হওয়া উচিত, আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি রহমতই করবেন। এর পর খুশু ও সম্মান সহকারে মসজিদে প্রবেশ করবে। এ পবিত্র ভূমি খুশু ও নম্রতা করারই উপযুক্ত। আবু সোলায়মান বর্ণনা করেন, হযরত ওয়ায়স কারনী একবার হজ্জে এসে মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করেন। তিনি মসজিদের দরজায় দণ্ডায়মান হলে লোকেরা তাঁকে বলল ঃ রসূলে পাক (সাঃ)-এর কবর শরীফ এটা। একথা শুনেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। অতঃপর সংজ্ঞা ফিরে আসার পর বললেন ঃ আমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও। যে শহরে মুহাম্মদ (সাঃ) মাটির অভ্যন্তরে রয়েছেন, সেই শহর আমার ভাল লাগে না। দাঁড়ানো অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যিয়ারত করা উচিত; যেমন তাঁর জীবদ্দশায় এভাবেই করা হত। তাঁর জীবদ্দশায় যতটুকু তাঁর দেহের নিকটবর্তী হবে, কবরেও ততটুকু নিকটবর্তী হবে। জীবিত অবস্থায় যেমন তাঁর দেহ স্পর্শ করা ও চুম্বন করা বেআদবী মনে করতে, তেমনি এখনও করা উচিত। কেননা, স্পর্শ করা ও চুম্বন করা খৃস্টান ও ইহুদীদের রীতি। জানা উচিত, রসূলে পাক (সাঃ) তোমার উপস্থিতি, দণ্ডায়মান হওয়া এবং যিয়ারত করার বিষয় অবগত হন এবং তোমার দরূদ ও সালাম তাঁর খেদমতে পৌঁছে। সুতরাং যিয়ারতের সময় তুমি কল্পনা কর, তিনি তোমার সম্মুখে কবরে বিদ্যমান আছেন। এর পর মনে মনে তাঁর মহান মর্তবার কথা চিন্তা কর। দরূদ ও সালাম পৌঁছার বিষয়টি এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তাআলা তাঁর কবরে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। তার কাজ হল উম্মতের সালাম তাঁর কাছে পৌঁছানো। এটা সেই লোকদের জন্যে, যারা তাঁর কবর শরীফে উপস্থিত হয়নি। অতএব যারা কবর শরীফ যিয়ারত করার আগ্রহে স্বদেশ ত্যাগ করে দুর্গম পথ অতিক্রম করে সেখানে উপস্থিত হয়, তাদের সালাম কিরূপে পৌঁছবে না?

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرا যেব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে,

আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দশ বার দরূদ প্রেরণ করবেন। এটা কেবল মুখে দরূদ পাঠ করার প্রতিদান। কিন্তু যেব্যক্তি তাঁর যিয়ারতের জন্যে কায়মনোবাক্যে উপস্থিত হয়, তার প্রতিদান কিরূপ হবে?

এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মিম্বরের কাছে যাবে এবং কল্পনা করবে, তিনি মিম্বরে দণ্ডায়মান আছেন এবং বিপুল সংখ্যক মুহাজির ও আনসার তাঁর চার পাশে বৃত্তাকারে বসে আছেন। তিনি তাঁদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান করছেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা কর, যেন কেয়ামতে তোমার ও তাঁর মধ্যে দূরত্ব না থাকে।

এ পর্যন্ত হজ্জের ক্রিয়াকর্মে অন্তরের ওযিফা বর্ণিত হল। হজ্জ সমাপনান্তে অন্তরে চিন্তা ও ভয় অপরিহার্য করে নেবে। আশংকা করবে, কে জানে তোমার হজ্জ কুবল হল কিনা! তুমি প্রিয়জনদের তালিকাভুক্ত হয়েছ, না বিতাড়িতদের দলে গ্রথিত হয়েছ। এ বিষয়টি নিজের অন্তর ও কাজকর্ম দ্বারা জেনে নেবে। অর্থাৎ, হজ্জের পর যদি অন্তরকে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত, আল্লাহর মহব্বতের দিকে অধিক আসক্ত দেখ এবং আমল শরীয়তের নীতি অনুযায়ী সংঘটিত হতে দেখ, তবে হজ্জ কবুল হয়েছে বলে ধরে নিতে পার। কেননা, আল্লাহ তাআলা তার হজ্জ কবুল করেন যাকে প্রিয় মনে করেন। তিনি যাকে প্রিয় মনে করেন তার পরিচালক হয়ে যান, মহব্বতের চিহ্ন তার উপর প্রকাশ করেন এবং আপন শত্রু ইবলীসের চাপ তার উপর থেকে সরিয়ে দেন। সুতরাং এ ধরনের বিষয় প্রকাশ পেলে বুঝতে হবে, হজ্জ কবুল হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি ব্যাপার উল্টা হয়, তবে বিচিত্র নয়, এ সফরে দুঃখ, কষ্ট ও গ্লানি ছাড়া অন্য কিছুই অর্জিত হয়নি। (নাউযু বিল্লাহ)

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত